মার্ডার

মার্জার

বিক্রমাদিত্য

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭২

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রাকর

শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯-এ বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

প্রণব শূর

ভূমিকা

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাহিত্য জীবনে বিভিন্ন দৈনিক, মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার অসংখ্য ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের সংখ্যার হিসেব আমি রাখিনি। তবে অধিকাংশ ছোট গল্পগুলি এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। তার কারন আমি প্রায় চল্লিশ বছর বিদেশে জীবন কাটিয়েছি। অনেক গল্পের প্রথম অক্ষরটি পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। তবে দেশে ফিরে শুনেছিলাম গল্পটি ছাপা হয়েছে, তবে যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সেই সংখ্যা আমি পাইনি। আমার প্রথম ছোট গল্প 'আংটি' 'তদানীন্তন' 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রয়াত শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গল্পটি পড়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'লিখে যাও'। তাঁর ঐ আশীর্বাদের কথা কখনই ভুলব না। আর দুইজন প্রয়াত প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শিবরাম চক্রবর্তী ঐ গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁর ভালবাসা, স্নেহ, আমার সব চাইতে বড় পুঁজি ছিল তিনিই ছিলেন বসুমতীর সম্পাদক প্রয়াত প্রাণতোষ ঘটক। আর একজনের কাছে আমি চিরকাল ঋণী থাকব। তিনি হলেন প্রয়াত বিশু মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আমার সাহিত্য জীবনের সব চাইতে বড় অনুপ্রেরণা।

আজ জানিনা কী কারণে দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে আমার এই ছোট গল্পগুলি প্রকাশ করবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। যে কারণেই হোক না কেন তিনি যে এই ছোট গল্পগুলি প্রকাশ করছেন এর জন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। এদিকে বন্ধুবর সুবীর ভট্টাচার্য তো সাহায্য করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছেন। অনেক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি গল্পগুলি সংশোধন করেছেন।

সবশেষে আমার এই ছোট গল্পগুলি সংকলন করতে ব্রতী হয়েছেন কল্যাণীয়া সাগরিকা ঘোষ। তার চেষ্টা না থাকলে এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। হয়তো ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে।

লেখক

লেখকের অন্যান্য বই

লাভমি কিস্মি
কে. জি. বি., রাশিয়ান সিক্রেট পুলিশ
রিভল্যুশন
মার্ডার অ্যাট মিডনাইট
লাভ, ক্রাইম, মার্ডার
ব্যাংক রবারি
সিন্ডিকেট
বেইমান
ডেডবডি
সিক্রেট এজেন্ট
পপি
কলগার্ল স্পাই
সর্দার
ফতেনগরের লড়াই
অপারেশন সার্চলাইট
নতুন যুগের স্পাই
স্পাই গেম
গোল্ড স্মাগলিং
ইনফরমার
স্বাধীনতার অজানা কথা
মুকুটহীন রাজা জওহরলাল
কমরেড স্পাই
গ্রেট গ্যাম্বলার
স্পাই
স্মাগলার
ডবল ক্রশ
অভিসন্ধ্যাস

বউকে খুন করেছেন কোনদিন ?

কিংবা কখনও কী আপনি মনে মনে দুষ্টু কল্পনা করেছেন যে, আই শ্যাল মার্ডার মাই ওয়াইফ !

না, কখনই আপনি আপনার বউকে খুন করতে পারেন না। এমন কী বউ খুনে করবার পরিকল্পনা আপনার চিন্তা শক্তির বাইরে।

কিন্তু আমার কথাটা সহজে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। ভেবে দেখুন ?

কোনদিন কী আপনার বউকে খুন করবার ইচ্ছে জাগেনি ? না, না আমি ঠাট্টা করছিনে। সিরিয়াসলি বলছি। অতীত দিনগুলোর কথাগুলো ভাবুন···চিন্তাশক্তিকে প্রখর করুন···মনে পড়েছে··· আপনি কতোবার বউর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। সামান্য ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনাদের দুজনের ভেতর কতো মনোমালিন্য হয়েছে। হয়তো আপনার বউ আপনাকে কোন কাজ করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু আপনার জিদ চেপে গেলো, না সেই কাজটি আপনি করবেনই। এই নিয়ে আপনাদের ঝগড়া শুরু হলো, আপনার মেজাজ চড়ে গেলো, আর আপনার ইচ্ছে হলো যে আপনি বউকে খুন করবেন। এই সময়ে আমি যদি আপনার হাতে একটি গুলিভরা বন্দুক এনে দিই, তাহলে আপনি কী করবেন ?

আমি হলফ করে বলতে পারি, আমি বন্দুকের গুলির শব্দ শুনতে পাবো।

'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, আমি কী সব অলুক্ষুণে কথা বলছি। কিন্তু মনে রাখবেন যে, বাস্তব জীবনের সত্যি কথা অনেক সময় কানে বেসুরো লাগে। কারণ জীবনের সব সত্যি কথাই অপ্রিয়।

এতক্ষণ ভণিতা করলুম এবার আমার গল্পটি শুনুন। আমার মনে একদিন এই অলুক্ষুণে চিন্তা হয়েছিলো যে, আই শ্যাল মার্ডার মাই ওয়াইফ।'

আমার কথা শুনে আপনি শক্‌ড হয়েছেন। তাই আপনার মনের দুশ্চিন্তা কাটাবার জন্যে সমস্ত ঘটনা খুলে বলছি। প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে নিই।

আমার নাম সুপ্রকাশ! ওটা আমার আসল নাম নয়। আমার ছদ্মনাম। আমি লেখক, বাজারে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমি ছদ্মনামে পরিচিত।

আমি সাহিত্যিক বটে, কিন্তু আমি ছিলুম খুব দিল দরিয়া প্রকৃতির লোক। আমার মনের ভেতর কোন মারপ্যাঁচ পাবেন না। আমি যে কথা ভাবি সেই কথাই বলে থাকি। সেইজন্যে অনেকে বলে থাকেন, সুপ্রকাশ স্পষ্ট বক্তা। আমার আর একটা মস্তো বড়ো দোষ আছে। অতি অল্পে, সহজেই আমার মেজাজটি বিগড়ে যায়। আর সেই সময়ে যতো অলুক্ষুণে বিতিকিচ্ছিরে কাণ্ড করে বসে থাকি। আর যেই মেজাজটি ঠাণ্ডা কুলপী বরফ হয়ে গেলো অমনি মনে মনে অনুশোচনা করতে লাগলুম হায় হায় কী করলুম। মস্তো ভুল করেছি। এরকম ভুল যেন আর কখনও না হয়।

মানুষের জীবনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমার জীবনেও একদিন পরিবর্তন এলো। আমার মুখ গম্ভীর হলো, হাসির রেখা মিলিয়ে গেলো।

আমার এই পরিবর্তন দেখে বন্ধুরা বেশ অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ;

'কী ব্যাপার ? সুপ্রকাশের কী হলো ?

'সব সময়ে মুখটা গোমড়া করে থাকে কেন ?

কেন আমার জীবনে পরিবর্তন এসেছিলো সে কথা খুলে কখনও কারও কাছে বলিনি। কিন্তু আজ আপনাদের কাছে সব কথা বলছি।

হঠাৎ আমার মাথায় একটি কুবুদ্ধি জেগেছিলো। আমি মনে মনে প্ল্যান করেছিলুম আমার বউকে খুন করবো। আই শ্যাল কীল হার। ভাবছেন আমি কি পাগলের প্রলাপ বকছি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন। আমার এই কথাগুলো পাগলের প্রলাপ নয়।

সত্যি কথা। স্ত্রী হত্যার কুবুদ্ধি সত্যিই আমার মনে একদিন প্রবল হয়েছিলো।

আর এই দুর্বুদ্ধি কেন হয়েছিলো জানেন? জেলাসি মানে ···হিংসে। আমার স্ত্রীকে আমি হিংসে করতুম···আই ওয়াজ জেলাস অব হার।

এই যে জেলাসির কথা বললুম এই জিনিসটি যে কী ব্যাধি সেকথা আপনারা নিশ্চয় জানেন, জেলাসি হলো হৃদয়ের ক্যানসার। এই ব্যাধির কোন দাওয়াই নেই। আপনার মনের ভেতর এই রোগটা ঢুকে গেলে আপনি তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরবেন। কোন ডাক্তার বদ্যি আপনার এই হৃদয়ের ক্যানসার সারাতে পারবে না।

অন্যর জীবনের, সাফল্যের কথা কিংবা লটারিতে অন্য কেউ মোটা টাকা বাজি জিতেছেন একথা সে যে আপনার মনের জেলাসির কথা দু'একদিনের মধ্যে ভুলতে পারবেন। আবার ধরুন আপনি এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। তার রূপ এবং দেহ আপনাকে আকৃষ্ট করেছে। মেয়েটি আপনার কাছে বসে থাকলে আপনি পরম আনন্দ অনুভব করেন।

কিন্তু বিপরীত দৃশ্যটাও আপনি কল্পনা করুন।

মেয়েটি সুন্দরী, আপনার বান্ধবী বা প্রেয়সী। হঠাৎ একদিন আপনাকে ডিঙিয়ে আর একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করলো। এবার আপনি হিংসের জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবেন। তাই নয় কী? আপনার বান্ধবী আপনার চোখের সামনে আর একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে এ আপনি কখনই সহ্য করতে পারবেন না।

তারপর এই সুন্দরী মেয়েটি যদি আপনার স্ত্রী হ'ন তাহলে আপনি শয্যাশায়ী হবেন এমনকি আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করবেন।

এবার আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আজ আমি যাকে নিয়ে গল্প করবো তিনি হলেন আমার স্ত্রী···আর সুন্দরী স্ত্রী। আমার স্ত্রীকে শুধু সুন্দরী বললে কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আসলে আমার স্ত্রী হলেন সুন্দরী এবং সেক্সী···।

জানি 'সেক্স'···কথাটি শুনলে আপনাদের মন ঘিন ঘিন করে উঠবে।

আপনি বসে বসে নিছক অনেক কিছু কল্পনা-কল্পনা করতে থাকবেন। আপনার কাছে সেক্স হলো নগ্ন দেহ, বিছানা, আরো কতো কী? সব কথাতো আর বিন্যাস করে বলা যায় না।

কিন্তু কোন সেক্সী মেয়ে যদি চিত্রাভিনেত্রী হন তাহলে পরিণামটা কি হবে কল্পনা করে দেখুন। মনের জেলাসি আরো বাড়বে। হ্যাঁ আমার স্ত্রী শুধু সুন্দরী মেয়ে ন'ন, তিনি হলেন পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী রাধা বোস।

আমার স্ত্রীর নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। রক্তমাংসের দেহে তাকে না দেখে থাকলেও ছবির রুপালি পর্দায় আপনি তাকে বহুবার দেখেছেন। কাউকে যদি বলেন যে, আপনি রাধা বোসের নাম শোনেননি কিংবা তার কোন ছবি দেখেননি তাহলে আপনি তরুণ বাঙালি সমাজের কাছে বোকা বনে যাবেন। আজকাল কলকাতার টপ হিরোইন অ্যাকট্রেস হলেন রাধা বোস। কলকাতার অলি গলি দিয়ে হাঁটুন। রাস্তায় রাস্তায় ব্যানারে-পোস্টারে আমার স্ত্রীর প্রলুব্ধকর ভঙ্গিমার ছবি দেখতে পাবেন।

শুধু কী তাই?

সকাল বেলায় খবরের কাগজের পাতা খুলেই আপনি আমার স্ত্রীর হাসি মুখ দেখতে পাবেন। সাবান কিংবা টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী রাধা বোস আমাদের সাবান ও টুথপেস্ট ব্যবহার করে থাকেন।" আমার স্ত্রীর মতামতের মূল্য হয়তো আপনি দেননা কিন্তু সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতায় আমার স্ত্রীর সুন্দর মুখ দেখেই টুক করে আপনি হয়তো জিনিস দুটো কিনে ফেললেন।

তারপর ভোর দশটায় সাঙ্গুভেলী রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসুন। ওখানে গেলে শুনবেন যে খদ্দেরের দল আমার স্ত্রীর প্রাইভেট লাইফ কিংবা কোন ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে তার মানসিক কিংবা দৈহিক কী সম্পর্ক এই নিয়ে মুখরোচক গল্প করছে। কখনও কখনও তার অভিনয় পারদর্শিতার কথাও শোনা যায়।

রাধা বোসের স্বামী, এই কথা ভাবতে প্রথমে আমি বেশ গর্ববোধ করতুম। কিন্তু তারপর একদিন যখন আমার স্ত্রী খ্যাতির তুঙ্গে পেঁছিলেন তখন আমার মনটা নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠলো।

মন খারাপ হবে না কেন বলুন ?

আমি নবীন তরুণ সাহিত্যিক। বাজারে দু'একটা উপন্যাস লিখে সবেমাত্র নাম কিনেছি। সমালোচকেরা ইতিমধ্যেই আমার নামে অনেক কিছু লিখেছেন। বলেছেন, আমি হলুম বুদ্ধিজীবী, প্রগ্রেসিভ, আরো কতো কি। সম্প্রতি সিনেমার বাজারে ঢুকেছি। সিনারিও ও সিনেমার গল্প লিখে থাকি। কিন্তু একদিন যখন দেখতে পেলুম যে আমার বউর নাম ভাঙিয়ে আমাকে সাহিত্য সিনেমার বাজারে ঢুকতে হচ্ছে তখন আমি বেপরোয়া বিদ্রোহী হয়ে উঠলুম। অসম্ভব! বউর পরিচয় দিয়ে আর কলকাতা শহরে কাটাতে পারিনে।

আমার মনে বিরক্তি, হিংসা সৃষ্টি হবার আর একটি কারণ আপনাদের কাছে খুলে বলি। আগে আমার বন্ধু-বান্ধবেরা আমার স্ত্রীর পরিচয় দেবার সময় বলতেন রাধা বোস, সাহিত্যিক, সুপ্রকাশের স্ত্রী। কিন্তু কিছুদিন বাদে পরিচয়ের ধারাটা পাল্টে গেলো। সবাই বলতে লাগলো, সাহিত্যিক সুপ্রকাশ বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী রাধা বোসের স্বামী। প্রথমে প্রথমে এই পরিচয় শুনে মুখ হাড়ি করেছি কিংবা প্রতিবাদ করেছি।

মনে মনে বেশ একটা কৌতুকবোধ করতুম।

কিন্তু পরে যখন সবাই আমার অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে রাধা বোসের পরিচয়কে বড়ো করবার চেষ্টা করলো তখন আমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।

রাস্তায় কিংবা রেস্তোরাঁয় আমাকে দেখলে বলতো দেখছিস রাধা বোসের স্বামী যাচ্ছেন। কিংবা ফিলমী দুনিয়ার চটকদার কাজগুলোর রিপোর্টারেরাও এসে জিজ্ঞেস করতো আচ্ছা বলুনতো বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর স্বামী হতে আপনার কীরকম লাগে ?

আমার মন মেজাজ বিগড়ে গেলো। আচ্ছা রাধা বোসের স্বামী

ছাড়া আমার কি অন্য পরিচয় নেই ! লোকের কথা শুনলে আমার মনে হতো রাধা বোস আমাকে বিয়ে করেছেন। আমি যেন রাধা বোসকে বিয়ে করিনি। বলুন কী দুর্ভোগ ? জীবনে যে কখনও স্ত্রীর খ্যাতি কিংবা গৌরব নিয়ে বাঁচতে হবে এ কথনই কল্পনা করিনি। হাজার হোক আমি পুরুষ মানুষ। নিজের পৌরুষত্ব এবং সত্ত্বাকে বজায় রাখতে চাই। মেয়ে মানুষের কাছে মাথা হেঁট করতে পারিনে। বলুন এই অপমান আর কতোদিন সহ্য করতে পারি ? আমি মনে মনে বলতে শুরু করলুম রাধা বোসকে বাজারে কে চিনতো ? রাধা বোসকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম। আমি তাকে সাহায্য না করলে কেউ তার প্রতিভার পরিচয় পেতো না।

জানি, আপনারা আমার কথার ঘোর প্রতিবাদ করবেন। বলবেন, বলছেন কী মশায় ? রাধা বোস সুন্দরী, যৌবন ও অভিনয় প্রতিভা দুটোই আছে। তার অভিনয়ের প্রতিভা আছে, এ কথাও অস্বীকার করব না। কিন্তু আপনারা জানেন কী দু'বছর আগে আমি যদি রাধা বোসকে সিনেমার জগতে টেনে না আনতুম তাহলে আপনারা কখনও তাকে সিনেমার রুপালি পর্দায় দেখতে পেতেন না। কস্মিনকালেও তার দেখা পেতেন না। রাধা বোস আপনাদের কাছে চিরদিনের মত অপরিচিত থেকে যেতো।

আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না ! বেশ তাহলে আজ আপনাদের কাছে অতীতের গল্প ফাঁদতে হবে।

*　　　*　　　*

রাধা বোসের ফিলমী জগতে আবির্ভাব হলো দু'বছর আগে টালিগঞ্জের কালীতারা ফিল্মস স্টুডিওতে।

কালীতারা ফিল্ম স্টুডিও কোথায় আপনি নিশ্চয় জানেন ? টালিগঞ্জের চণ্ডী ঘোষ রোড আপনি চেনেন। এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যান। প্রথমে আপনার চোখের সামনে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও পড়বে। এই স্টুডিও ছেড়ে আর একটু এগিয়ে যান। দেখবেন আপনার বাঁ দিক দিয়ে একটা ছোট গলি চলে গেছে। সেই রাস্তার শেষ বাড়িটা হলো কালীতারা স্টুডিও। বাজারে কালীতারা স্টুডিওর বেশ নাম ছিল।

কিন্তু আজ সে স্টুডিওর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আপনাদের মনকে ভারাক্রান্ত করব না।

এবার আমার সঙ্গে কালীতারা স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে চলে আসুন।

ফ্লোরে ইন ডোর শুটিং হচ্ছে। ছবির নাম "শতাব্দীর প্রহসন"। ছবির পরিচালনা করছেন সৌম্যেন চাটুজ্যে, প্রডিওসার বিনোদ পাল আর হিরোইনের নাম হলো গৌরী বাগ্‌চি।

জানি গৌরী বাগ্‌চির নাম শুনে আপনি আনন্দে লাফিয়ে উঠছেন। কারণ আজকালকার বাজারে গৌরী বাগ্‌চী হলেন সবচাইতে পপুলার স্টার। তার বই বাজারে হিট হয়। কোন সিনেমা হলের সামনে যদি বিরাট জনতা দেখতে পান তাহলে বুঝতে পারবেন যে ঐ হলে গৌরী বাগ্‌চীর বই হচ্ছে।

'শতাব্দীর প্রহসনের' লেখক হলুম আমি। তাই আজ আমাকে ফ্লোরে দেখতে পাচ্ছেন।

বড়ো গভীর চিন্তা আর অনুভূতি দিয়ে বইটা লিখেছিলুম। এই গল্পে বেশ খানিকটা বাস্তবতা ছিলো। আমার এক বন্ধুর মুখে গল্পটি শুনে উপন্যাসটি লিখেছিলুম। বাজারে বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বইটি হিট হলো। প্রডিউসার বিনোদ পাল এসে আমাকে বললেন যে আমার বইটি সিনেমায় রূপান্তরিত করবেন। ছবির পরিচালনা করবেন সৌম্যেন চাটুজ্যে।

হিরোইনের চরিত্র হলো একটি গণিকার। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে আজ সে গণিকার জীবন অবলম্বন করেছে। ঘটনাচক্রে একটি বার-তেরো বছরের ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। ছেলেটি তাকে দিদি বলে ডাকে। ছেলেটি, বেকার ভবঘুরে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, দলবাজি করে আর বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয়।

কাহিনীর একটি দৃশ্য ছিলো কলকাতার এক বড় রাস্তা। রাস্তায় ডেমোনোস্ট্রেশন হচ্ছে। পুলিশ আর ধর্মঘটীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে গেছে। ধর্মঘটীদের তাড়াবার জন্যে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। রাস্তা টিয়ার গ্যাসে আচ্ছন্ন। অনেক দূরে পুলিশ

দাঁড়িয়ে আছে। আর একপ্রান্তে ধর্মঘটীরা দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় আরো দু'তিনজন আহত ধর্মঘটীদের দেহ পড়ে আছে, পুলিশের গুলিতে এরা আহত হয়েছে। ছেলেটিও তার মধ্যে একজন।

হিরোইন ছেলেটির কাছে যাবে। পেছন থেকে জনতা চীৎকার করে বলবে যাবেন না, চলে আসুন, চলে আসুন, দেখতে পাচ্ছেন না পুলিশ গুলি চালাচ্ছে।

কিন্তু মেয়েটি জনতার চীৎকারে কান দেবে না।

আহত ছেলেটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলবে, দিদি বড্ডো ব্যথা।

হিরোইন জিজ্ঞেস করবে কোথায়?

ছেলেটি আঙুল দিয়ে বুকের ডানদিকে দেখাবে। মেয়েটি ঐ জায়গায় হাত দেবে। রক্তে হাত ভিজে গেলো। হিরোইন আতঙ্কিত হয়ে বলবে···রক্ত।

ছেলেটি আবার কাতর কণ্ঠে বলবে: হ্যাঁ দিদি রক্ত। বড্ডো ব্যথা। রক্তটা চুষে দাও।

হিরোইন আর কোন প্রশ্ন না করে মুখ দিয়ে রক্ত চুষে দেবে। একটু বাদে ছেলেটির মৃত্যু হবে।

এক বীভৎস মুখ নিয়ে হিরোইন আবার উঠে দাঁড়াবে। সে তার সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেলবে। সে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। তার আশে পাশে কী হচ্ছে কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।

দূর থেকে আবার জনতার চীৎকার শোনা যাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেলের শব্দ ভেসে আসবে।

চলে আসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী মজা দেখছেন—জনতার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

কিন্তু হিরোইন জায়গা থেকে নড়বে না। পুলিশের পদধ্বনি শোনা যাবে। তারা এগিয়ে আসবে।

এবার জনতার ভেতর থেকে একটি লোক ছুটে গিয়ে হিরোইনকে ধরে আনবার চেষ্টা করবে।

হিরোইন এবার চেতনা ফিরে পাবে। সে চীৎকার করে উঠবে। তার কণ্ঠস্বরে থাকবে ঘৃণার সুর। সে বলবে: জাহান্নামে যাক

তোমাদের রাজনীতি, জাহান্নমে যাক তোমাদের দেশ সেবা। মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে আজ যারা এই শিশুকে হত্যা করলো আমি তাদের ঘৃণা করি—ঘৃণা করি—ঘৃণা করি…

তারপরেই ফেড আউট। অনেক অনুভূতি, আবেগ দিয়ে দৃশ্যটি লিখেছিলুম। এই দৃশ্যের অভিনয়ের উপর সমস্ত ছবির সফলতা নির্ভর করছিলো।

ডিরেক্টর হিরোইন মিস্ বাগ্‌চিকে দৃশ্যটি বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেনঃ বড়ো কঠিন সীন। বেশ একটু অনুভূতি আর আন্তরিকতা দিয়ে আপনাকে এই দৃশ্যটি অভিনয় করতে হবে।

গৌরী বাগ্‌চি খ্যাতনামা অভিনেত্রী বটে কিন্তু তবু যেন এই দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো। চরিত্রকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলতে পারলেন না। তাঁর অভিনয় দেখে আমি সন্তুষ্ট হলুম না। বিশেষ করে জাহান্নামে যাক, তোমাদের রাজনীতি, জাহান্নমে যাক তোমাদের দেশ সেবা, এই কথাটি বলবার সময় আমি তাঁর কণ্ঠে নিস্তেজতার আভাস পেলুম। এই কয়েকটি কথা বলবার সময় নায়িকার চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু মিস্ বাগ্‌চীর কণ্ঠস্বরে আমি কোন আবেগের আভাস পেলুম না। এই দৃশ্যে আমি চেয়েছিলাম স্বতস্ফূর্ত অভিনয়। চেয়েছিলুম বাস্তব জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে।

পরপর তিনটি শট্ নেয়া হলো। কিন্তু কোন শটই আমার কিংবা ডিরেক্টরের মনঃপূত হল না। বারবার একই দৃশ্যের টেক নেয়াতে মিস্ বাগ্‌চীও যেন একটু বিরক্ত হলেন। টেক রিপিট করবার অভ্যেস তার নেই। হাজার হোক তিনি হলেন বর্তমান বাংলার সব চাইতে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী। তাঁর প্রতিটি সেকেন্ডের মূল্য আছে। দিনে তাঁকে তিন চারটে ছবিতে অভিনয় করতে হয়। মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর 'মুডের' পরিবর্তন হয়। একটা শট পরপর রিপিট টেক করবার পর তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।

কিন্তু ডিরেক্টর সৌম্যেন চাটুজ্যে নাছোড়বান্দা। বললেনঃ আর একবার শট নেবো।

আবার নতুন করে, 'টেক' শুরু হলো।

সাউণ্ড, ক্যামেরা রেডি, সাইলেন্স। ক্যামেরাম্যান একবার লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালেন। তারপর একবার মুখ বার করে বললেন, লাইট।

দুটো বড়ো বড়ো আর্কল্যাম্প দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

ক্ল্যাপার বয় এসে বললো ; কালীতারা ফিল্মস্, "শতাব্দীর প্রহসন," সিন নাম্বার···সে-ভেন, টেক নাম্বার সিক্স···

টেক শুরু হলো।

মিস্ বাগ্‌চী তাঁর সংলাপ বলতে লাগলেন।

আমি ডিরেক্টরের পেছনে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে লাগলুম।

কিন্তু এবারও আমি মিস্ বাগ্‌চীর অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হলুম না। আমার মনে হলো তিনি একটা তোতাপাখির মতো ডায়লগ বলে যাচ্ছেন।

কিন্তু এবারকার অভিনয়ে ডিরেক্টর সন্তুষ্ট হলেন। কারণ বারবার তিনি 'কাট' বলে মিস্ বাগচিকে বাধা দিতে পারেন না। হিরোইনকে রাগাবার তাঁর ইচ্ছে নেই। ডিরেক্টর চীৎকার করে বললেন : 'এক্সলেণ্ট, প্রিণ্ট ইট'। কিন্তু ডিরেক্টরের কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠলুম কাট।

আমার চীৎকার শুনে উপস্থিত সবাই বিস্মিত ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমি কী পাগলের প্রলাপ বকছি। ক্যামেরার শব্দ বন্ধ হলো, আর্কল্যাম্প নিভে গেলো। মিস্ বাগ্‌চী রেগে সেট থেকে বেরিয়ে গেলেন। ডিরেক্টর হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা কি উনি বুঝতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন কী করবেন।

মিস্ বাগ্‌চী আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি কে ?

আমি অতি ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম ; 'ঐ যে হিরোইনের ভূমিকায় আপনি অভিনয় করেছেন ; ঐ চরিত্র আমিই সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ আমি হলুম শতাব্দীর প্রহসনের লেখক।'

মিস্ বাগ্‌চী মুখ ঝামটা মেরে বললেন, আপনার বই এই শতাব্দীর সব চাইতে বড়ো প্রহসন এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরনের থার্ড রেট লেখকের বইতে আমার অভিনয় করবার ইচ্ছে নেই।

এই বলে মিস্ বাগ্‌চী ডিরেক্টরের কাছে গেলেন। বললেন, আপনার প্রডিউসারকে বলবেন, আমি তার ছবিতে আর অভিনয় করবো না। আমার কন্ট্রাক্ট ক্যানসেল করে দেবেন।

ডিরেক্টর সমস্ত ঘটনায় এতো হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না! তিনি বুঝতে পারলেন যে ব্যাপারটি অনেকদূর গড়িয়েছে।

আমি এবার সমস্ত ঘটনা মীমাংসার জন্যে অপরাধীর সুরে বললুম, মিস্ বাগ্‌চী, আমি আপনার অভিনয়ের নিন্দে করছিনে। হয়তো আপনি নায়িকার চরিত্রকে যথার্থ ভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে আপনার অভিনয়ের কোথাও যেন খুঁৎ রয়ে গেছে। আপনার অভিনয় দেখবার পর এই চরিত্রকে আমার বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না। আমি হলুম লেখক···আমার···,

আমার কথা শেষ হবার আগেই মিস্ বাগ্‌চী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন রাবিশ। আমি অনেক বড়ো বড়ো লেখকের বইতে অভিনয় করেছি। আমার অভিনয়ে কেউ কোন খুঁৎ পায়নি। কি নাম আপনার ?

এবার আমার অহমিকায় আঘাত লাগলো। এমন বিশ্রী কণ্ঠস্বরে এর আগে কেউ কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। আমার মেজাজও চড়ে গেলো। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম যে ডিরেক্টর টেকনিশিয়ানরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটি যে-কী ও'রা যেন বুঝতে পারছেন না।

কিন্তু মিস্ বাগ্‌চীর ধমক শোনার পর আমি গলার স্বর আর কর্কশ করতে পারলুম না। পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করবার স্পর্ধা আমার নেই। তাই খুব ছোট জবাব দিলুম; আমার নাম সুপ্রকাশ।

মিস্ বাগ্‌চী আবার ঝাপ্টা মেরে বললেন রাবিশ! শুনুন

মিস্টার সুপ্রকাশ। আপনার কাহিনীর চরিত্র একেবারে অবাস্তব। মনে রাখবেন আমি গণিকা নই। আপনি যে গণিকার চরিত্র এঁকেছেন তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন মিল নেই। আমি ঐ ধরনের চরিত্রে আর অভিনয় করতে পারবো না।

এবার আমারও মেজাজ চড়ে গেলো।

আমি এবার মিলিটারী মেজাজ দেখিয়ে বললুম—আপনি হয়তো ঐ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারছেন না। না, আপনার এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করিবার ক্ষমতা নেই। ঐ যে এক্সট্রা মেয়েগুলো ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁদের মধ্যে যে কেউ আপনার চাইতে ভালো অভিনয় করবেন।

হয়তো এই কথা বলে আমি আগুনে ঘি ঢাললুম। অপমানে মিস্ বাগ্চীর মুখ রক্তিম হলো। তিনি দপ করে জ্বলে উঠলেন। রাগে তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো। প্রসাধনের আড়ালে তাঁর মুখের কদর্যতা বেরিয়ে পড়লো।

মিস্ বাগ্চী আমার এই কথা শোনার পর ডিরেক্টরের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন; এই অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

মিস্ বাগ্চী এই বলে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সেটের সবাই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘটনা যে এতো দ্রুততালে ঘটবে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

খানিক বাদে আমরা সবাই আবার জীবন ফিরে পেলুম। আমি তাকিয়ে দেখলুম যে সবাই মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে।

ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে বললুমঃ সরি। বেশ একটু ঝাঁঝ দিয়ে ডিরেক্টর জবাব দিলেনঃ সুপ্রকাশ আপনি বই-এর লেখক এবং নাট্যকার হতে পারেন কিন্তু আমার ছবির নায়িকাকে অপমান করবার কোন অধিকার আপনার নেই। আমাদের ছবি তোলার ব্যাপারে আপনি নাক গলাবেন না। একবার দেখুন তো আপনি কী হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছেন। এখন মিস্ বাগ্চী যদি অভিনয় করতে রাজী না হ'ন এবং কন্ট্রাক্ট ক্যানসেল করেন তাহলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হবে। আমরা তাঁর পরিবর্তে হিরোইন কোথায় পাবো? মিস্

বাগচী হলেন আমার বই-এর হিরোইন। তাঁকে বাদ দিয়ে তো আর ছবি তোলা যায় না।

আমি ডিরেক্টরের কথার প্রতিবাদ করলুম। বললুম: আপনি চিন্তা করবেন না মিস্ বাগ্চীর চাইতে ভালো অ্যাকট্রেস্ আপনাকে এনে দেবো।

এই বলে আমি এক অবাক কাণ্ড করে বসলুম। এক্সট্রা মেয়েদের ভেতর থেকে একটি মেয়েকে সেটে নিয়ে এলুম। জিজ্ঞেস করলুম কী নাম তোমার?

রাধা।

রাধা কী?

রাধা বোস।

আমি এবার রাধার মুখের দিকে তাকালুম। গায়ের রং একটু ময়লা বটে কিন্তু তার চোখ দুটো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর দেহভরে আছে সেক্স।

রাধাকে দেখে আমি আকৃষ্ট হলুম। আমার মন বলতে লাগলো রাধা অভিনয় করতে পারবে।

এবার রাধাকে মিস্ বাগ্চীর পার্ট দিয়ে বললুম: নাও সীনটা আক্ট করো।

ডিরেক্টর এবং অন্যান্য টেকনিকশিয়ানরা অবাক হয়ে আমার কাণ্ড দেখতে লাগলেন। আমি কী করছি হয়তো ওরা বুঝতে পারেননি।

আমার নির্দেশমত রাধা অভিনয় করে গেলো। তার অভিনয়ের ভেতর কোন জড়তা ছিলো না। আমার মনে হলো রাধা মিস্ বাগ্চীর চাইতে এই রোলো আরো ভালো অভিনয় করবে। ওর অভিনয়ে আমার কাহিনীর চরিত্র আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

আমি এবার ডিরেক্টরকে গিয়ে বললুম, এই মেয়েটিকে নিন। আপনার হিরোইনের রোলে চমৎকার অভিনয় করতে পারবে।

ডিরেক্টর এতোক্ষণ কোন কথা বলেননি। এবারও আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন।

একটু বাদে প্রডিউসার বিনোদ পাল তার অফিস থেকে ছুটে

স্টুডিওতে এলেন। তাঁর মুখে ব্যস্ততা এবং চিন্তার ভাব ফুটে উঠেছে। মিস্ বাগ্চী সেট থেকে বেরিয়ে যাবার খবর পেয়ে তিনি বেশ বিচলিত এবং চিন্তিত হয়েছেন। বিনোদ পাল আমাকে বললেন: কী পাগলামো করছেন: মিস্ বাগ্চী এই ছবিতে অভিনয় না করলে আমাকে পথে বসতে হবে। মিস্ বাগ্চীর বক্স-অফিস ভ্যালু আছে। আর একটা এক্সট্রা মেয়েকে দিয়ে তো আর হিরোইনের রোল করানো যায় না। কোন ডিস্ট্রিবিউটার আমার ছবি নেবে না। আর শুধু তাই নয়—কন্ট্রাক্টের কিছু টাকা আমি মিস্ বাগ্চীকে আগাম দিয়েছি। আর কিছুটা ব্যাংকে দিয়েছি। আপনার জন্যে আমি ক্ষতি স্বীকার করতে পারিনে।

এই বলে প্রডিউসার আবার ছুটে চলে গেলেন। বললেন মিস্ বাগ্চীর খোঁজে যাচ্ছি।

আমরা সবাই বাড়ি ফিরে এলুম।

তিনদিন বাদে প্রডিউসার এবং ডিরেক্টর আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

প্রডিউসার বললেন, দেখুনতো আমাদের কী মুসকিলে ফেলেছেন। মিস্ বাগ্চী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে উনি আমার ছবিতে আর কাজ করবেন না। আজ কেন, ভবিষ্যতেও নয়। ওকে বাদ দিয়ে ছবি তুলতে গেলে আমার বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

আমি চুপ করে রইলুম।

প্রডিউসার আবার মুখ কালো করে বলতে লাগলেন, আপনি নতুন লেখক। আপনার বইটা আমার ভালো লেগেছিলো।

আপনাকে সিনেমার বাজারে চালু করবার জন্যে একটা চানস্ দিয়েছিলুম। কিন্তু আপনি যে আমাকে এতোটা বিপদে ফেলবেন কথনও কল্পনা করতে পারিনি।

ডিরেক্টর বললেন, মিস্ বাগ্চীকে বাদ দিতে গেলে আমাদের অনেকগুলো সীন নতুন করে তুলতে হবে।

হিরোইনের পার্টটি কাকে দিচ্ছেন, আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

—কেন সেদিন আপনি যে মেয়েটিকে নিয়ে স্ক্রীন টেস্ট দিলেন,

সেই মেয়েটিকে দিয়ে কাজ চালাবো। নতুন মুখ, রিস্ক যথেষ্ট আছে। কিন্তু মেয়েটি দেখতে ভালো আর অ্যাকটিংও ভালো করে। রোলটা করতে পারবে।

রাধা বোস, ঐ মেয়েটিকে তো স্ক্রীন টেস্ট দিয়েছিলেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

নামটি তো আপনি বেশ মনে রেখেছেন। হ্যাঁ মেয়েটির নাম রাধা বোস। দেখতে ভালো এবং অভিনয়ও ভালো করে। শুধু বাজারে একটু পাব্লিসিটি দিলেই চলবে।

কিন্তু প্রডিউসার জোর আপত্তি করলেন। প্রথমে বললেন যে নতুন কোন মেয়েকে দিয়ে হিরোইনের রোল করাতে গেলে তাকে বিস্তর পয়সা খরচ করতে হবে। তারপর গৌরী বাগচীকে বাদ দিয়ে কি ছবি তোলা যায়?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টরের মতামতই গ্রহণ করা হলো। রাধা বোসকে হিরোইনের রোলটা দেয়া হলো।

আমি আর কোনো মন্তব্য করলুম না। আমার জন্যেই যখন গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে তখন চুপ করে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

পরের দিন থেকে বাজারে রাধা বোসের পাব্লিসিটি শুরু হলো।

শহরের বিভিন্ন স্থানে রাধা বোসের ছবি টাঙানো হলো। সংবাদপত্রে, চটকদার সিনেমার কাগজে রাধা বোসের ছবি বেরুলো।

ছ'মাস বাদে কলকাতার বিভিন্ন সিনেমা হলে শতাব্দীর প্রহসনের রিলিজ হলো।

প্রিমিয়ার শো দেখতে আমি গিয়েছিলুম। নিস্তব্ধ হয়ে দর্শক-বৃন্দেরা এই ছবি দেখলো। বিশেষ করে রাস্তার ডেমনস্ট্রেশনের সীনটি এতো প্রাণবন্ত হয়েছিলো যে দর্শকেরা বেশ খানিকক্ষণ সময় নিজেদের সীট আঁকড়ে ধরে বসেছিলো। ছবি চলার সময় কারো মুখ দিয়ে টু-শব্দটি বেরোয়নি। আমি বুঝতে পারলুম ছবি বাজারে হিট করবে।

রাধা বোসের জয়জয়কার হলো। ছবির শেষে সবাই রাধা

বোসকে ঘিরে ধরলো। প্রডিউসার ডিরেক্টর তাকে আগলে রাখলেন।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলুম। সবাই রাধা বোসকে বাহবা দিচ্ছে দেখে আমার মনে একটু যন্ত্রণা হলো। আমি হলুম শতাব্দীর প্রহসনের লেখক। গল্পের প্রতিটি চরিত্র আমারই সৃষ্টি। অথচ সবাই কিনা রাধা বোসকে বাহবা দিচ্ছে। আমার তারিফ করছে না। কী অন্যায় ?

আর শুধু কী তাই ?

রাধা বোসকে আবিষ্কার করলো কে ?

আমি।

এই ছবির আগে রাধা বোস কী ছিলো ?

সিনেমার সামান্য এক্সট্রা গার্ল।

অজ্ঞাত, অপরিচিত জগৎ থেকে তুলে এনে আজ তাকে আমি ফিলমি দুনিয়ায় তুলে ধরলুম। অথচ যে দর্শক আজ রাধা বোসকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে কিন্তু ছয়মাস আগে কেউতো তার দিকে তাকায়নি। প্রডিউসারতো তাকে কোনো পার্টই দিতে চাননি। একেই বলে ফিল্মি দুনিয়া।

দর্শকদের মন্তব্য আমার কানে ভেসে এলো। 'এক্সলেণ্ট-ওয়াণ্ডারফুল'। রাধা বোস কী সুন্দরী দেখছিস ? বডি ফর্মেশনে চোখ আটকে যায়। রাধা বোসকে দেখলে মনে হবে হেলেন অব ট্রয়কে দেখছি।

এই কথা শোনবার পর আমি রাধা বোসের দিকে তাকালুম। কোন সন্দেহ নেই যে রাধা বোস সুন্দরী। অপূর্ব সুন্দরী। তার চোখ দুটো এতো সুন্দর, যে সবার মনকে নিমেষে ভুলিয়ে দেয়।

আমি গিয়ে ঘরের একপ্রান্তে দাঁড়ালুম। আমাকে একলা দেখে রাধা দৌড়ে ছুটে আমার কাছে এলো।

তারপর ধন্যবাদ দিয়ে বললো, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। আপনার উপকার আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। আপনার সাহায্য না পেলে আমি চিত্রজগতে স্থান পেতুম না।

আজ রাধা বোসের মুখে আমার তারিফ শুনে মনটা খুশিতে ভরে উঠলো !

কেন জানিনে সেদিন থেকে আমি রাধা বোসের প্রেমে পড়লুম।

* * *

রাধাকে বিয়ে করবার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হলো। কিন্তু তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার মতো সাহস আমার ছিলোনা। কী করে রাধাকে বলবো রাধা, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

এদিকে প্রতিদিন বাজারে রাধার যশ বাড়ছে। সবাই তার গুনগান করছে। আর লোকের মুখে রাধার প্রশংসা শুনে তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা যেন আরো প্রবল হলো।

সদা সর্বদাই ভাবতুম রাধাকে আমার চাই। জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাধা বোস হবে আমার স্ত্রী। বাজারের সবাই বলবে যে রাধা বোস হলেন সাহিত্যিক সুপ্রকাশের স্ত্রী। আমার সঙ্গে বিয়ের পর কেউ তার প্রতি প্রলোভনের দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে না। পরস্ত্রীর প্রতি লোভনীয় দৃষ্টি দেয়া নিষেধ।

তারপর একদিন বুকে সাহস বেধে রাধাকে গিয়ে বললুম তোমাকে একটা কথা বলবো—। রাধা তার মিষ্টি চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো বলুন, কী বলবেন ?

আমি হেসে বললুম ; বলুন নয় ; বলো।

তারপর একেবারে মরিয়া হয়ে বললুম ; রাধা আমি তোমাকে ভালোবাসি।

রাধা যেন আমার কথাগুলো বুঝতে পারলো না। আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ওর দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আমি বুঝতে পারলুম যে ওর মনের উত্তেজনা বেড়েছে।

আমি আবার বেপরোয়া হয়ে বললুম, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

রাধা কোন কথা বললো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি ব্যাকুল কণ্ঠে বললুম ; বলো, জবাব দাও।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাধা ছোট জবাব দিলো ; আমি

রাজী সুপ্রকাশ।

আমাদের বিয়ের এনগেজমেন্টের খবর সমস্ত বাজারে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো।

বাজারে আমাদের দুজনকে নিয়ে বহু মুখরোচক কথাবার্তা হতে লাগলো। অনেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ; কে বেশি ভাগ্যবান—সাহিত্যিক সুপ্রকাশ—না সিনেমা অ্যাকট্রেস রাধা বোস।

আমাদের দু'জনের ছবি দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো।

সেই জীবনীতে বলা হলো যে সাহিত্যিক সুপ্রকাশ একজন উদীয়মান খ্যাতনামা লেখক। আর রাধা বোস হলেন জনপ্রিয়া অভিনেত্রী।

বিয়ের প্রস্তাব করবার আগে আমি রাধার অতীত জীবনী জানবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করিনি। রাধার মা বাবা বেঁচে আছেন কিনা জানবার চেষ্টা করিনি। এই সমস্ত ব্যাপারে আমি সাধারণত গোপনীয়তা পছন্দ করি। একদিন রাধার আলাপ-আলোচনার পর এইটুকু জানতে পেরেছিলুম যে রাধার মা বেঁচে নেই। রাধা নিজের কথা আমাকে কিছু বলেনি।

তারপর একদিন আমাদের বিয়ে হলো। আমাদের বিয়ের খবরটা বাজারে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। লোকের মুখে শুনতে পেয়েছিলুম যে আমাদের বিয়ের খবরে অনেক প্রডিউসার ডিরেক্টর নিরাশ হয়েছিলেন। এমন কী রাধার দু একটা ছবির কণ্ট্রাক্ট ক্যানসেলও হয়ে গিয়েছিলো।

প্রডিউসার ডিরেক্টর স্তাবকদের মনে কষ্ট দেখে আমি ভারী আনন্দ পেলুম। এবার হয়তো আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমার আসল চরিত্র কী? আপনারা বলবেন আমি হলুম স্যাডিস্ট অর্থাৎ লোকের কষ্ট দেখলে আমি আনন্দ পাই। আপনাদের মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ আমি করবো না।

বিয়ের পর আমার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এলো।

আগে আমি সাহিত্যচর্চা, পড়াশুনা নিয়ে মেতে থাকতুম। কিন্তু বিয়ের পর বউকে আগলে থাকাই হলো আমার প্রধান কাজ।

লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমি বউর বিজনেস ম্যানেজার হলুমে।

আর যেদিন থেকে আমি হলুম আমার বউর বিজনেস ম্যানেজার, সেদিন থেকে আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হলো।

আগে ছিলুম সরল সহজ, আমার মুখে ছিলো প্রাণখোলা হাসি···এবার থেকে আমি হলুম গম্ভীর···বাঁকা চোখ দিয়ে প্রডিউসারদের দিকে তাকাতুম···আর শুধু তাই নয়—আমার মনে একটি নতুন চিন্তাধারা জাগলো। আর সেই চিন্তাধারা হলো হিংসে। ইংরাজিতে আমরা যাকে বলি জেলাসি।

বিজনেস ম্যানেজারের কাজটি ছিলো বড়ো ঝকমারির কাজ। বউ কবে কোথায় কোন ছবিতে কাজ করবে, কবে তার শুটিং হবে, কণ্ট্রাক্টে কী লেখা থাকবে···ইত্যাদি ইত্যাদি···প্রথমে প্রথমে এই কাজ করতে আমার আনন্দ হতো, গর্ব করতুম।

পরে দেখতে পেলুম যে এই কাজে কোন গৌরব নেই। আর আমার অহমিকায় আঘাত যোগাবার প্রধান কারণ হলো যে প্রডিউসার ডিরেক্টরেরা সবাই আমার বউর সুখ্যাতি গুণগান করতো কিন্তু কেউ আমার কথা বলতো না। ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতুম যে আজ কলকাতার বাজারে আমার কোন মূল্য নেই।

আমি যে সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আমার যে একটা নিজস্ব সত্ত্বা আছে একথা যেন সবাই ভুলে গেলো। কেউ আমার তারিফ করতো না। সবার কাছে আমার পরিচয় হলো আমি হলুম চিত্রাভিনেত্রী রাধা বোসের বিজনেস ম্যানেজার। কখনও কখনও এরা হয়তো বলতেন যে আমি হলুম রাধা বোসের স্বামী। আমার একদল শত্রু ছিলো। তারা আড়ালে বলতে শুরু করলো, আরে ছেড়ে দে সুপ্রকাশের কথা। ব্যাটা আজকাল বউর টাকায় স্টেট একসপ্রেস সিগারেট খায়।

আগে প্রকাশকেরা আমার কাছে বই লেখার তাগিদ দিতে আসতেন। কিন্তু কিছুদিন পর ওরা এসে আমার বউর খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। আমার বউর সঙ্গে বসে গল্প করতেন এবং সুবিধে পেলে কোন নতুন লেখকের বইয়ের তদ্বির করতেন। বলুন না ম্যাডাম একবার আপনার প্রডিউসারকে আমাদের এই সদ্য

প্রকাশিত বইটির কথা। যদি উনি বইটি সিনেমা করেন তাহলে দর্শকেরা ছবিটি লুফে নেবে।

আর একদিন এক সম্পাদকের মন্তব্য শুনতে পেলুম।

আমারই এক বন্ধুকে উনি বললেন, সুপ্রকাশ, আরে মশায় বিয়ের পর লোকটা একেবারে নেতিয়ে গেছে। আজকাল কী আর ওর লিখবার ক্ষমতা আছে। ওর লেখক সত্ত্বা একেবারে মরে গেছে। ওর চাইতে ওর বউয়ের প্রতিভা আছে। ভালো অভিনয় করে—আর হোয়াট এ লাভ্‌লি ফেস। বউটির সঙ্গে দু'মিনিট গল্প-গুজব করে মনে আনন্দ পাই।

সম্পাদকের মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে দুঃখিত হলুম। এক-কালে ভদ্রলোক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমার লেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন···বার-বার লেখা পাঠাবার জন্যে তাগিদ দিতেন। কিন্তু আজ······

না আজ আমাকে ওর প্রয়োজন নেই। ওর কথায় আমি হলুম 'ওয়াস আউট।'

আমার মনে হলো আজকাল সংসারের সবাই যেন আমার শত্রু হয়েছে। যাদের কাছে একদিন আমার প্রয়োজন ছিলো আজ তাদের কাছে আমার মূল্য নেই। আমি একেবারে অপদার্থ বনে গেছি।

কেন ?

আমি চিন্তা করতে বসলুম। দুনিয়ার সবাই আজ আমার শত্রু হলো কেন ? আমার অপরাধ কোথায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি কোথায় !

কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করবার পর আমি বুঝতে পারলুম যে আমার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার প্রধান কারণ হলেন আমার অভিনেত্রী স্ত্রী রাধা বোস।

আমি এবং রাধা যদি কখনও বাইরে একসঙ্গে বেরতুম তাহলে সবাই এসে আমাদের ঘিরে ধরতো।

আমার স্ত্রীকে ওরা হাজার প্রশ্ন করতো মিস্‌ বোস, আপনি এর পরে আর কোন ছবিতে রোল করছেন। মিস্‌ বোস, আমাদের একটি অটোগ্রাফ দিন। মিস্‌ বোস আপনি "আকাশ প্রদীপ" বইতে কী চমৎকার অভিনয় করছেন। চিরদিন মনে থাকবে।

এদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হিংসে হতো। তাই ওদের ভুল সংশোধন করবার জন্যে বলতুম উনি মিস্ বোস নন। বিয়ের পর ওর পদবি বদলে গেছে। ওর নাম হলো রাধা মিত্র।

রাধার স্তাবকের দল আমার জবাব শুনে নিরাশ হতো। রাধার যে বিয়ে হয়েছে একথা তারা কখনই বিশ্বাস করতে চাইতো না। তাদের কাছে রাধা অবিবাহিতা, আমার অস্তিত্বকে ওরা একেবারেই স্বীকার করতে চাইতো না।

আপনি রাধা বোসের স্বামী? সবাই কৌতূহলী হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতো। যেন ব্যাপারটা একেবারেই বিশ্বাস যোগ্য নয়।

ওদের প্রশ্নের ভেতর এমন একটা ভাব ছিলো যেন এই বিয়ে করে আমি মস্তোবড়ো একটা অপরাধ করে ফেলেছি।

আমি বসে বসে ভাবতুম, আমি রাধা বোসের স্বামী না রাধা বোস আমার স্ত্রী। কী তার পরিচয়। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলুম যে সুন্দরী খ্যাতনাম্নী স্ত্রী থাকলে স্বামীকে তার নিজের সত্ত্বা হারাতেই হয়।

একদিন কলকাতার একটি সিনেমার কাগজে লিখলো রাধা বোস হলেন ঃ সেক্সকুইন।

ব্যস এবার থেকে বাজারে আমার স্ত্রীর পরিচয় হলো ঃ সেক্স কুইন রাধা বোস।

ওরা সেক্সকুইন রাধা বোস বলেই সন্তুষ্ট হতেন না। ঐ পদবির সঙ্গে ওরা আর একটা বিশেষণ যোগ করে দিলেন ঃ গ্ল্যামার গার্ল।

পান সিগ্রেটের দোকানে গিয়ে দেখতুম যে দোকানীরা আমার বউয়ের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। যেন কোন দেবীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। প্রথমে প্রথমে মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠতো ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা। ঘরের বউয়ের ছবি কিনা পানওয়ালার দোকানে উঠেছে। না, লজ্জা শরম আর কিছু রইলো না। কিছুদিন পরে এই বিরক্তি হিংসায় পরিণত হলো। আমি রক্ষণশীল অর্থাৎ আপনারা যাকে বলেন 'কনজারভেটিভ' প্রকৃতির লোক নই। আমার বউকে নিয়ে লোকে একটু আধটু গল্প করুক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে পুরুষেরা কী ধরনের গল্প করে থাকেন

আপনারা নিশ্চয় জানেন। অতএব আমার স্ত্রীকে সেক্সকুইন বলাটা আমি খুব সরলমনে গ্রহণ করতে পারলুম না। আমার মনে হলো 'সেক্স' শব্দটির সঙ্গে একটি বিশ্রী নোংরা ইঙ্গিত জড়িয়ে আছে। আমার মনের বিরক্তির আর একটি কারণ আপনাদের বলবো। অন্যের বউ যদি খেমটা নাচে আমার আপত্তি নেই। বরং আমি তাদের উৎসাহ দেবো আর সেই পরস্ত্রীর দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকাবো কিন্তু আমার বউকে নিয়ে পানওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা বিশ্রী সব মন্তব্য করবে, মুখরোচক গল্প করবে এ যেন আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতুম না।

আমার মনে বার বার একই কথা ঘুরতে লাগলো: সেক্সকুইন কথাটির মানে কী? তাহলে কী আমার স্ত্রী···

বাকি কথা আর ভাবতুম না। হয়তো এই ধরনের কথা চিন্তা করলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

আমার স্ত্রীর সেক্স-অ্যাপিল আছে একথা আমি স্বীকার না করলেও বাজারের সবার মুখে একই কথা ঘুরতে লাগলো: সেক্স-কুইন গ্ল্যামার গার্ল রাধা বোস।

একদিন বাড়িতে এসে দেখলুম কালীতারা ফ্লিমসের এক স্টিল ফটোগ্রাফার আমার বউর বিভিন্ন পোজের ছবি তুলছে। আমাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে ফটোগ্রাফার এবং তার সহকর্মী বেশ হক-চকিয়ে গেলো। রাধা আমাকে বললো, পাব্লিসিটির জন্যে এই সব ছবির দরকার।

এই ধরনের বিভিন্ন পোজে ছবি তোলা আমি যেন একেবারেই বরদাস্ত করতে পারলুম না। একবার ভাবলুম লোকটাকে মেরে তাড়িয়ে দেবো। কিন্তু যেই আমার স্ত্রী হাসি মুখ নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল অমনি আমার সমস্ত রাগ দূর হয়ে গেলো।

এবার আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে আমার বউকে আর কোন সেক্সী রোলে পার্ট করতে দেবো না। কিন্তু দু একদিনের মধ্যে আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে বাধা পেলুম!

প্রডিউসার বিনোদ পাল একদিন এসে আমার কাছে ধর্ণা দিলেন।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "মনের মুকুট" বইটি পড়েছেন।

"মনের মুকুট" বইটি সম্প্রতি বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। এক নতুন লেখকের লেখা। বর্তমান পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বইটি লেখা হয়েছে। বাজারে বইটি 'তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।'

"মনের মুকুট" বইটি আমি পড়িনি কিন্তু বিনোদ পালের কাছে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করলুম না।

তাই নাক সিঁটকে ছোট জবাব দিলুম ঃ পড়েছি, কিন্তু বইটি আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। কাহিনীর চরিত্রগুলো অবাস্তব।

আমার জবাব শুনে বিনোদ পাল নিরাশ হলেন। হয়তো তিনি আমার কাছ থেকে বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনতে পাবেন আশা করেছিলেন।

কিন্তু পাঠকেরা সবাই বলছে যে বইটির বিশেষত্ব হলো কাহিনীর চরিত্র। বিনোদ পাল আবার মন্তব্য করলেন।

গল্পের নায়িকা হলেন সেক্সী গার্ল লোকের সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়ায়। আমি কঠোর মন্তব্য করার চেষ্টা করলুম।

আমরা ভাবছি ঐ রোলে আপনার বউকে বেশ ভালো মানাবে। আমি ঠিক করেছি যে ঐ বইটি ছবি করবো। বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর অমিত গুপ্ত ছবিটি পরিচালনা করবার দায়িত্ব নিয়েছেন।

অমিত গুপ্তের নাম শুনে আমার মনে আবার হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। কারণ সম্প্রতি বাজারে আমার স্ত্রী এবং অমিত গুপ্তকে নিয়ে বেশ মুখরোচক গল্প চালু হয়েছিলো। সেই কাহিনীর কিছু কথা আমার কানেও এসেছিলো।

আমার হিংসার আর একটি কারণ হলো অমিত গুপ্ত হলেন একজন নামকরা পরিচালক। পশ্চিমবাংলায় সিনেমা জগতে যে নতুন চিন্তাধারা এসেছে অমিত গুপ্ত তারই প্রবর্তক। তাঁর প্রতিটি ছবি সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কান, ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে অমিত গুপ্তের ছবি দেখানো হয়। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অমিত গুপ্তের ছবির ভেতর নতুনত্ব থাকে।

অমিত গুপ্তের প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ ছিলো না কিন্তু আমার স্ত্রী অমিত গুপ্তের পরিচালনায় অভিনয় করবেন শুনে আমি হিংসায় জ্বলে উঠলুম।

আমার মনে প্রথম প্রশ্ন জাগলো অমিত গুপ্ত কী তরুণ না বৃদ্ধ।

আমি অমিত গুপ্তকে নিজের চোখে দেখেছি। তাই আজ শুধু কল্পনার চোখে অমিত গুপ্তকে দেখতে লাগলুম।

আমার স্ত্রীর কাছেও অমিত গুপ্তের কথা শুনেছিলুম। তিনি প্রায়ই অমিত গুপ্তের কথা বলতেন; এবং শুধু তাই নয়, ও'র ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিলেন। আমি এবার ভাবতে শুরু করলুম; কতো বয়স হবে অমিত গুপ্তের।

আমার স্ত্রী বললেন, উনি আমার সমবয়সী হবেন।

আমার সমবয়সী।

হঠাৎ আমার মনে একটা চিন্তা জাগলো। আশ্চর্য! আমার স্ত্রী হিসেব করে দেখেছেন যে অমিত গুপ্ত আমার সমবয়সী। উনি তাহলে বয়েসের হিসেব করতে শুরু করেছেন। কেন?

এই প্রশ্নটা মনে জাগতেই আমার মনে হাজার পাপচিন্তা এসে ঢুকলো। ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে হিরোইনের একটা নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে একথা আমিও শুনেছিলুম। আজ আবার পুরানো চিন্তাধারা নিয়ে ভাবতে শুরু করলুম।

আমার স্ত্রী···ফিল্ম ডিরেক্টর অমিত গুপ্ত···তাহলে একে অন্যের সম্বন্ধে উৎসুক। নইলে বয়েসের হিসেব নিকেষ হচ্ছে কেন?

আমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো।

বিনোদ পাল আবার বলতে শুরু করলেন; অমিত গুপ্ত এতোদিন বোম্বাইতে ছবি তুলতেন। 'মনের মুকুর্ট' হবে তাঁর প্রথম বাংলা ছবি।

আমার মন বলতে লাগলো যে অমিত গুপ্ত বাংলা ছবি তৈরি করতে কলকাতায় আসছেন না। ও'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাধা বোসের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা।

আমি কোন কিছু বলবার আগে বিনোদ পাল বলতে শুরু করলেন; আজকাল দর্শকেরা নতুন ছবি দেখতে চায়। রাধা বোস

অভিনেত্রী আর অমিত গুপ্ত ডিরেক্টর, খুব জোরদার কম্বিনেশন হবে।

আমি আপত্তির সুর তুললুম। হাজার হোক রাধা বোস আমার স্ত্রী। উনি কী ধরনের বইতে অভিনয় করবেন না করবেন তার উপর মন্তব্য করবার ষোলো আনা অধিকার আমার আছে।

বললুম ; মিস্টার পাল, আপনি ভুল করেছেন। 'মনের মুকুট' বইতে আমার স্ত্রী কখনই অভিনয় করতে পারেন না। ঐ রোলে তাঁকে মানাবে না। আর পশ্চিমবাংলার দর্শকেরা যাই বলুন না কেন আমি অমিত গুপ্তকে উঁচুদরের ডিরেক্টর বলে গণ্য করিনে। কম্বিনেশন খুব উঁচু দরের নয়।

বিনোদ পাল আমার জবাব শুনে হয়তো একটু নিরাশ হলেন। তিনি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, অমিত গুপ্ত এবার আর্ট ছবি করছেন না। এ ছবি হবে কমার্শিয়াল ছবি, উনি যেচে আপনার স্ত্রীকে রোলটা অফার করেছেন।

বিনোদ পালের জবাব শুনে আমি বিস্মিত হলুম। অমিত গুপ্ত যেচে আমার স্ত্রীকে একটি সেক্সী ফ্লাট গার্লের রোল দিয়েছেন। কেন? আর আমার স্ত্রী তো কখনও একথা আমাকে বলেননি। রাধা আমার কাছ থেকে কথাটি গোপন করে গিয়েছে কেন? আমি যেন আমার স্ত্রী এবং অমিত গুপ্তের ভেতর একটি অবৈধ সম্পর্কের আভাস পেলুম।

আমার মেজাজটি বিগড়ে গেলো। একটু ঝাঁঝের সুরে বললুম, মাপ করবেন ঐ রোলটি আমার স্ত্রীর নয়। মিস্ বাগচীকে ডাকুন।

মিস্ বাগচীর নাম উল্লেখ করার একটা বিশেষ কারণ ছিলো। কারণ "শতাব্দীর প্রহসন" তুলবার সময় মিস্ বাগচীর অভিনয় করা নিয়ে আমার সঙ্গে প্রডিউসার বিনোদ পালের যে ঝগড়া বিবাদ হয়ে গিয়েছিলো সে কথা আমি সহজে ভুলতে পারিনি।

আমার জবাব শুনে বিনোদ পালের মুখটি লাল হয়ে গেলো। উনি যেন আমার কথায় শ্লেষের আভাস পেলেন। তবু অপমান সহ্য করে আবার বলতে শুরু করলেন। ঐ রোলটিতে আপনার স্ত্রী'র প্রতিভা খুলবে। আজকালকার বাজারে উনি হলেন 'সেক্সকুইন'।

সেক্সী মেয়ের রোলে অভিনয়ে ও'র জুড়িদার আর কেউ নেই। আমার শতাব্দীর প্রহসনে উনি যখন অভিনয় করলেন তখন আপনিই তো বলেছিলেন যে গণিকার রোলে ওকে খুব ভালো মানাবে।

আমার মেজাজ চড়ে গেলো। আমার বইয়ের নায়িকা ছিলো পৃথক ধরনের। এই বইয়ের নায়িকার সঙ্গে ঐ নায়িকার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিনোদ পাল আমার কড়া জবাবে ঘাবড়ে গেলেন না। এবার একটু বাঁকা হেসে বললেন, ভুল আমি করিনি। ভুল আপনি করেছেন। হয়তো আপনার স্ত্রীর প্রতিভা আপনি জানেন না। মনে রাখবেন উনি শুধু গ্ল্যামার গার্লের রোলে নয় 'সী ক্যান প্লে দি রোল—

বিনোদ পাল কী বলতে চায় আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না। আজকালকার প্রডিউসাররা হিরোইনদের কী চোখে দেখেন আমি ভালো করে জানতুম। বিনোদ পালের কথার ভেতর কী ইঙ্গিত ছিলো আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। বিনোদ পাল আবার বলতে শুরু করলেন আমি হলুম প্রডিউসার। বিস্তর মেয়েকে নিজের হাতে স্টার বানিয়েছি। কোন মেয়ে কী রোল করতে পারবে আমি মুখ দেখলেই বুঝতে পারি।

আবার মেজাজ চড়ে গেলো।

আমি চীৎকার করে বলে উঠলুম গেট আউট, গেট আউট, আই শ্যাল কীল ইউ।

আমার চীৎকার শুনে বিনোদ পাল হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে চলে গেলেন।

আমার মেজাজ যখন ঠাণ্ডা হলো তখন আমার মাথায় এসে প্রচুর চিন্তা জড়ো হলো। ভাবতে শুরু করলুম বিনোদ পালের আমার সম্বন্ধে এতো বিকৃত ধারণা হয়েছে কেন? আমার স্ত্রীর কী চরিত্র আমি কী জানি নে?

আজ বসে বসে আমি অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলুম।

আজ কেন জানিনে আমার মনে হলো যে আমার স্ত্রী আমার

কাছে অপরিচিত। সত্যিই তো আমার স্ত্রীর কুমারী জীবনের কিছুই আমি জানিনে।

রাধার মা বাবার জীবনী আমার কাছে অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকা আছে। সত্যি কথা বলতে কী আমি বিয়ের পর কোনদিনই রাধার সঙ্গে মন খুলে কথা বলিনি। হয়তো বলবার অবকাশ পাইনি। শুটিংয়ের কাজে ভোরবেলা রাধা বেরিয়ে যেতো আর আমি দশটা অবধি বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে বাকি সময়টা বারে রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিতুম।

আজ বিনোদ পালের কথা শুনবার পর আমার স্ত্রীর জীবনের আর একটি রূপ দেখতে পেলুম।

কী সেই রূপ!

সিনেমার এক্সট্রা গার্ল।

সামান্য একটা রোল পাবার জন্যে সে কতো লোককে খোসামোদ করেছে।

কী ধরনের খোসামোদ!

আমি আবার বিকৃত মন নিয়ে বিশ্রী চিন্তা করতে লাগলুম।

তারপর?

বহু অবান্তর কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

আমি ভাবতে শুরু করলুম: এক্সট্রা গার্ল রাধা বোসকে আমি ফিল্মস্টারে রূপান্তরিত করেছি। আজ সবাই তাঁর গুণগান করছে। কলকাতার কাগজপত্রে রাস্তার অলিতে-গলিতে শোনা যায় রাধা বোসের কথা। আমার মনে পড়লো কিছুদিন আগে ফিল্মস্টার নামে একটি সিনেমা সাপ্তাহিক আমার স্ত্রীকে নিয়ে কতো মুখরোচক মনোরঞ্জন কাহিনী রচনা করেছেন। সেই কাগজের পাতায় লেখা ছিলো যে শিগ্‌গিরই রাধা বোস তাঁর স্বামীকে ডিভোর্স করবেন। কেন?

রাধা বোসের স্বামী মাতাল অবস্থায় এবং রাত প্রায় শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসেন। শুধু দেরীতে বাড়ি ফেরা নয় উনি আজকাল পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী রাধা বোসকে মার-

ধোর করতে শুরু করেছেন।

বাজারে আর একটি জনশ্রুতি রটে গিয়েছিলো যে আমি হলুম, দুশ্চরিত্র, মাতাল, লম্পট···

আজ আমি এই সব বিশ্রী জনশ্রুতি, আমার স্ত্রীর অতীত জীবন, তাঁর চরিত্র নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

না একস্ট্রা গার্ল রাধা বোস আমার স্ত্রী এছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয় নেই···।

মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করতে পারলুম না। সদা সর্বদাই আমার মনের মধ্যে বিশ্রী কথাগুলো এসে উঁকি মারতে লাগলো।

মনের চিন্তাকে দূর করবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে মনে কোন শান্তি পেলুম না।

যেখানে যাই সেখানেই দেখতে পেলুম আমার স্ত্রীর প্রচুর ছবি টাঙানো আছে।

রাধা বোস আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

আমি কে?

পশ্চিমবাংলার দর্শকেরা কী জানে যে আমি হলুম রাধা বোসের স্বামী। না, না, ওটা আমার পরিচয় নয়। আমার পরিচয় হলো আমি হলুম সাহিত্যিক আর আমার স্ত্রী হলেন রাধা বোস।

নিজের পৌরুষত্বকে জাহির করবার জন্যে একটা কথা সবাইকে বলা প্রয়োজন মনে করি যে স্বামীর পরিচয়ে স্ত্রীর পরিচয়। স্ত্রীর অন্য পরিচয় সমাজে অবান্তর···

আবার রাস্তায় টাঙান আর একটা ছবি দেখতে পেলুম।

রাধার চোখে জল।

বিচিত্র বহুরূপী রাধা বোস।

রাধা বোস কী সত্যিই পর্দায় অভিনয় করে না বাস্তব জীবনেও অভিনয় করে।

তাহলে কী আমার স্ত্রী রাধা বোস আমার দৃষ্টির আড়ালে অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করছে?

এই বিচিত্র জগতে সবই সম্ভব। রাধার প্রেমিক কে? অমিত গুপ্ত। না আর কেউ?

বাসে উঠলুম।

আমার পাশের সীটে বসে এক ভদ্রলোক আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ছিলেন।

প্রথম পাতায় ভিয়েতনামের যুদ্ধের খবর বেশ বড়ো করে ছাপা হয়েছে। সংবাদের নীচে একটি বড়ো বিজ্ঞাপন।

কিসের বিজ্ঞাপন?

রাধা বোসের?

ঐ বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে আমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।

আমি বাস থেকে নেমে পড়লুম।

কোথাও যে একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো তার যো নেই।

শহরের চারদিকে, অলিতে-গলিতে রাধা বোস আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ঐ সব ছবি দেখে আমি মনে মনে বলতে লাগলুম রাধা তুমি ফিল্ম অ্যাকট্রেস নও, তুমি হলে ঘরের বউ, হাউস ওয়াইফ।

না রাধা আমি তোমার ছবি রাস্তার অলিতে-গলিতে দেখতে চাইনে।

তোমার ছবি থাকবে আমার ড্রয়িংরুমে—আমার শোবার ঘরে।

* * *

কিছুক্ষণ রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করবার পর হঠাৎ আমার মনে আর একটি পাপ চিন্তা এসে ঢুকলো।

আমার মন বলতে লাগলো আমি আমার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করি।

কেন অবিশ্বাস করি?

আমার স্ত্রী হয়তো ভ্রষ্টা দুশ্চরিত্রা······

নিজের মনে মনে হাজার প্রশ্ন করলুম। রাধা কোনদিন তুমি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলোনি। কোনদিন তো আমাকে বলোনি যে, সুপ্রকাশ শোনো—বিয়ের আগের আমার জীবনের কথা, বাড়ির কথা। রাধা আমার স্ত্রী। ধর্ম সাক্ষী করে তোমাকে বিয়ে করেছি। স্বীকার করি তুমি আজ পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত চিত্রা-

ভিনেত্রী। লোকে তোমার সম্মান করে…স্বীকার করি তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। আমি আরো মেনে নিচ্ছি…তুমি রাত দশটা এগারোটা-বারোটা…কিংবা একটার সময় পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসতে পারো। কেন এতো রাতে তুমি বাড়ি ফিরে এলে সেই প্রশ্ন করবার কোন অধিকার কি আমার নেই? আমি কী শুধু নামের স্বামী? না রাধা আমি ভুলে যাইনি যে আজ দেশের সবাই তোমাকে সিনেমার পর্দার আড়ালে দেখবার জন্যে পাগল। তুমি হলে গ্ল্যামার গার্ল, সেক্সকুইন। অনেকদিন নিজের মনে মনে ভেবেছি তোমার কাছে মন খুলে সব কথা বলবো। কিন্তু যখনই তোমার কাছে কোন কথা বলতে গেছি তখনই তুমি মৃদু হেসে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছ।

রাধা বোস—না তুমি আমার স্ত্রী…তুমি পশ্চিমবাংলার সেক্স কুইন হতে পারো কিন্তু আমার কাছে তোমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শুধু —মাই ওয়াইফ। কিন্তু আজ প্রডিউসার বিনোদ পাল অতোগুলো বিশ্রী মন্তব্য করলেন কেন? অমিত গুপ্ত তোমাকে তার ছবির নায়িকা করতে চান কেন? না না ঐ রোলে তোমাকে একেবারে মানাবে না। ওরা তোমাকে বিকৃত চরিত্রে দর্শকদের কাছে প্রেজেন্ট করতে চায়। না রাধা, তোমার চরিত্রকে রূপ দিয়ে আমি উপন্যাস লিখবো আর সেই বইতে তুমি অভিনয় করবে। ঐ বই আমি নিজে ডিরেক্ট করবো। কতোদিন ধরে ভাবছি যে আমি ফিল্ম ডিরেকশনের কাজ শুরু করবো। আজকাল কতো হেজিপেজি লোক ফিল্ম ডিরেক্টর হয়ে গেলো আর আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক সুপ্রকাশ আমার গ্ল্যামার গার্ল, সেক্সকুইন স্ত্রীকে নিয়ে ফিল্ম তৈরি করতে পারবো না। একশোবার পারবো। আমার সেই ছবিতে তুমি হবে সৌন্দর্যের রানী, তোমার মহৎ চরিত্র সিনেমার প্রতি শটে ফুটে উঠবে।

কিন্তু…

আমার মনের ভেতর 'কিন্তু' শব্দটি উঁকি মারলো।

কিন্তু বাজারের সবাই বলছে তুমি অমিত গুপ্তকে ভালোবাসো।

তুমি আমাকে ডিভোর্স করতে চাও। কারণ আমি লম্পট মদ্যপ…

বাজারের লোক আমাদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে বিশ্রী কুকথা বলছে।

আমি লম্পট নই, মদ্যপ নই। ওরা বলে আমি তোমাকে মারধোর করি। সেদিন তোমার হাত একটু জোরে ধরেছিলুম। বউর হাত কে না ধরে। বউর হাত ধরলেই কী ওটাকে মারপিট করা বলে।

'ফিল্ম স্টার কাগজ' লিখেছে যে, আমি বলেছি যে তোমার সুন্দর মুখ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবো।

ডাহা মিথ্যে কথা।

সব মনগড়া, কল্পনার ফানুস।

কিন্তু রাধা তুমি আমাকে স্পষ্ট করে খুলে বলো তুমি কী অমিত গুপ্তকে ভালোবাসো ?

এই সব কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ার মতো আর একটি কথা আমার মনে জাগলো।

অমিত গুপ্ত-রাধা বোস, প্রেম, নগ্ন দেহ, একশয্যা।

না না একী সব কুচিন্তা আমার মনের ভেতর এসে ঢুকেছে।

অসম্ভব।

আচ্ছা রাধা, তোমার কী মনে পড়ে প্রথম যেদিন তোমাকে কালীতারা স্টুডিওতে দেখেছিলুম তুমি অসংখ্য এক্সট্রা গার্লের সঙ্গে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলে। আমি তোমাকে ঐ দল থেকে ফ্লোরের কাছে নিয়ে গেলুম। ডিরেক্টরকে বললুম যে, এই নিন আপনার হিরোইন···

সেদিন আমি তোমার অন্যরূপ দেখেছিলুম। তোমার কালো স্নিগ্ধ চোখ, তোমার মুখের মিষ্টি হাসি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। তোমার অভিনয় প্রতিভায় আমার কোন বিশ্বাস ছিলোনা। আমি শুধু তোমার দেহ সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলুম। হয়তো প্রথম দৃষ্টিতে আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলুম। কিংবা নিজের বড়াই জাহির করবার জন্যে আমি তোমাকে সেটে টেনে এনেছিলুম। সবাইকে বলেছিলুম যে, মিস্ বাগ্চীর চাইতে তুমি আরো ভালো অভিনয় করতে পারবে। সেদিন তোমার এবং নিজের ভবিষ্যৎ এবং

ভাগ্য নিয়ে আমি জুয়ো খেলেছিলুম। আমি সেদিন কখনই কল্পনা করতে পারিনি যে তুমি পশ্চিমবাংলার একজন জনপ্রিয়া অভিনেত্রী হবে। একথা আমি সত্যিই কল্পনা করিনি। যদি সেদিন আমি জানতুম যে পশ্চিমবাংলার দর্শকেরা তোমাকে লুফে নেবে তাহলে আমি তোমাকে ঐ ভীড়ের মধ্য থেকে টেনে বের করতুম না। আজ সবার মুখে যখন তোমার শরীর নিয়ে আলোচনা শুনতে পাই তখন আমার মনটা বিষিয়ে ওঠে।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে আমার মন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। যতোই আমি রাধার কথা ভাবতে লাগলুম ততোই আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো। আমার মতো হতভাগ্য যারা, আই মীন, যাদের সুন্দরী স্ত্রী আছে এবং যে সুন্দরী স্ত্রীর নামযশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে আর বেচারী স্বামী তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে, আজ তারা আমার হৃদয়ের বেদনার কথা বুঝতে পারবেন। হ্যা, সুন্দরী নারীর রূপ এবং দেহ আমাকে দগ্ধ করে। একী অসহ্য যন্ত্রণা। অসম্ভব! এই যন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে রেহাই পেতে হবে।

কোথায় যাবো!

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে আমার মনে হলো যে, এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার সব চাইতে বড়ো ওষুধ হলো মদ।

আমি আর কোন কথা না ভেবে সোজা অলিম্পিয়া বারের ভেতর ঢুকলাম।

আমি অলিম্পিয়া বারের মালিক এবং খদ্দেরের কাছে বিশেষ পরিচিত।

কলকাতা শহরে ঐটে আমার সব চাইতে প্রিয় বার।

বিকেল হলেই আমি ঐ বারে গিয়ে আসর জমিয়ে বসতুম।

বেয়ারা এসে হুইস্কির পেগ টেবিলে রেখে যেতো। মৌমাছির মতো স্তাবকেরা এসে আমার টেবিলে জড়ো হয়ে বসতো। প্রথমে প্রথমে ওরা আমার স্ত্রীর প্রশংসা করতো আর হুইস্কির গ্লাসে

ঢালতো। প্রথম কিছুদিন স্ত্রীর প্রশংসা শুনতে আমি কোন আপত্তি করিনি। কিন্তু তারপরে যেন ঐ প্রশংসা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো।

এরপর থেকে আমি ওদের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনলে মুখ গম্ভীর করতুম।

আমার গাম্ভীর্যের কারণ ওরা বুঝতে পারতো। কয়েকদিন পরে আমি এই স্তাবকদের মুখে শুনতে পেলুম অন্য কথার সুর। ওরা প্রকাশ্যে আমার স্ত্রীর নিন্দে করতো না বটে কিন্তু টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি আমাকে শোনাতো। আর এই সব কেচ্ছা কেলেঙ্কারির মধ্যে আমার স্ত্রীর নাম থাকতো প্রথমে। ওরা এ সব কেচ্ছার কথা বলতে বেশ একটু লজ্জা ও অস্বস্তি প্রকাশ করতো। হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে বলতো আপনাকে একটা কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছি সুপ্রকাশ। আমি চোখ তুলে এমন ভাবে ওদের মুখের দিকে তাকাতুম যেন কিছুই বুঝতে পারিনি কিন্তু আমি মনে মনে জানতুম ওরা কী বলতে চায়। আমার স্ত্রীর অবৈধ প্রেমের কাহিনী শোনাবে এবার। একটু ভারিক্কি চালে ওদের কথার জবাব দিতুম বলুন না··· কী শুনলেন আজকে টালিগঞ্জের পাড়ায়?

ওরা আমার কথার ইঙ্গিতে বুঝতে পারতো। তারপর শুরু হতো মুখরোচক গল্প।

শুনেছেন, আজকে রাধা বোসের ড্রেসিং রুমে ডিরেক্টর অমিত গুপ্তকে দেখা গিয়েছিলো।

ড্রেসিং রুমে! আমি যেন বক্তার কথা বুঝতে পারিনি। তাই আমার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার হিংসার রেশ ফুটে ওঠে।

এই কথার খেই ধরতেন আর একজন বক্তা। তার পেটে সবেমাত্র চার পেগ পড়েছে। তাই উনি মন আলগা করে প্রথম বক্তার কাহিনীকে সমাপ্ত করেন।

আরে মশায়, কী আর বলবো। আজকাল তো টালিগঞ্জ পাড়ায় ঐ কাহিনী হলো সবচাইতে হট স্টোরি, রাধা বোস এবং অমিত গুপ্তের প্রেমকাহিনী। আপনি বউর উপর একটু নজর দিন নইলে বুঝলেন···

বক্তা তার কথা অসমাপ্ত রাখলেন। হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিলেন। গ্লাস শেষ হয়ে গেলো। তারপর আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে শুরু করলেন।

তার কথায় বাধা পড়লো আর একজন নতুন স্তাবক এসে আমার টেবিলে বসল। এর আগে কখনও একে দেখিনি···আজ স্তাবকের সংখ্যা বাড়বে না কেন? আমার টেবিলে বিনে পয়সায় মদ পাচ্ছে···

নতুন ভদ্রলোক গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলতে শুরু করলেন, শুনেছেন আজকের প্রেসের খবর।

প্রেসের খবর?

আমি আবার কৌতূহলী হয়ে কান খাড়া করি···

কী ব্যাপার বলুন তো?

রাধা বোস অমিত গুপ্তের বিয়ের খবর একেবারে পাক্কা। রাধা বোস শিগ্‌গিরই ওর স্বামীকে ডিভোর্স করবেন···হাজব্যাণ্ড লোকটি অদ্ভুত লোক তো? স্ত্রী কী করছে না করছে একেবারেই খোঁজ খবর রাখে না।

প্রথম বক্তা এবার নতুন বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন, আপনি যার টেবিলে বসে মদ গিলছেন অর্থাৎ যিনি আমাদের মদ খাওয়াচ্ছেন উনিই হলেন রাধা বোসের হাজব্যাণ্ড।

নবাগত ভদ্রলোকটি এই জবাব শুনে লজ্জা পেলেন।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সরি আই ডিড ন'ট মীন ইট।

বাজারে যা গুজব শুনেছি সেই কথা আপনাকে বললুম।

এমনি ধরনের বহু বিচিত্র ঘটনা আমি প্রতিদিন অলিম্পিয়া বারে বসে শুনতুম।

আজও বারে গিয়ে আমার বাধা ধরা টেবিলে বসলুম। বেয়ারা এলো। আমার ব্রাণ্ডের হুইস্কির অর্ডার দিলুম।

বয় আমার অর্ডার নিয়ে চট্ করে চলে গেলো না। আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলো। হয়তো কোন প্রশ্ন করবে।

আমি ধমক দিয়ে বললুম দাঁড়িয়ে কি দেখছো? ড্রিংকস্ নিয়ে এসো। একটু কুণ্ঠিত হয়ে ওয়েটার জিজ্ঞেস করলো: স্যার

মেমসাহেব আসবেন না স্যার।

কিন্তু আমি যেন শুনতে পেলুম বয় বলছেঃ মেমসাহেব এসেছিলেন।

আমি বিস্মিত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম ঃ মেমসাহেব এসেছিলেন। কার সঙ্গে এসেছিলো।

আমার শেষের প্রশ্নে একটু জোর ছিলো।

আমার প্রশ্ন শুনে বয় লজ্জা পেলো।

হেসে বললোঃ মেমসাহেব আসেননি। আমি শুধু জানতে চাইছিলুম উনি কী আসবেন!

আমি জবাব শুনে বিব্রত বোধ করলুম।

সবাই মেমসাহেবকে চায়। আমাকে কারু প্রয়োজন নেই।

মনে মনে হেসে বললুমঃ নারী, তোমার সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আর ঐ সুন্দর মুখ তোমার একমাত্র সম্পদ। ঐ সম্পদ যদি তোমার না থাকে তাহলে আজ সংসারে কেউ তোমাকে আদর করবে না।

একটু বাদে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলুম।

আমার কানে অসংলগ্ন টুকরো কথা ভেসে এলো।

দেখছিস ঐ টেবিলে কে বসে আছে? সেক্সকুইন রাধা বোসের হাজব্যাণ্ড বসে বউর পয়সায় মদ গিলছে···

আমি হুইস্কির গ্লাসটি টেবিলে রাখলুম। তারপর ঐ টেবিলে বসে যারা কথাবার্তা বলছিলো তাদের দিকে তাকালুম। ইচ্ছে হলো একবার চীৎকার করে বলি, ও মশাই হাজব্যাণ্ডের একটা নাম আছে। আমার নাম সুপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের লেখক সুপ্রকাশের নাম শোনেননি।

মনে মনে এই কয়েকটি কথা বললুম বটে কিন্তু মুখ খুলে স্পষ্ট করে ওদের কাছে কিছু বলতে পারলুম না।

হঠাৎ আমার চিন্তা ধারায় বাধা পড়লো।

আমার পুরানো এক সাংবাদিক বন্ধু বিজন সেন এসে আমার টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। আমার পয়সায় মদ গেলা। বিজন সেন স্তাবক নন—সাংবাদিক বলে স্পেশাল

ফেভার দাবী করেন।

বিজন সেন আমার টেবিলে বসলেন। তারপর বয়কে ডেকে ডেকে নিজেই হুইস্কির অর্ডার দিলেন।

তারপর বেশ উঁচু গলায় বললেন। সুপ্রকাশবাবু আজ আপনাকে অলিম্পিয়ার বারে দেখতে পাবো একেবারে কল্পনা করিনি।

বিজন সেন স্থানীয় একটা সিনেমা সংবাদ পত্রের সম্পাদক। মেয়েদের জীবনের স্ক্যান্ডাল বিক্রী করে উনি জীবিকা অর্জন করেন।

আমি কোন জবাব দেবার আগেই উনি আবার বলে উঠলেন। তারপর মিসেস কোথায়? আই মীন দি সেক্সকুইন।

আজ বিজন সেনের মুখে সেক্সকুইন কথাটি শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। আমি জানতুম যে এই সব সাংবাদিকের দল সিনেমা স্টারদের পয়সায় কিংবা ফিল্মস্টারদের স্বামীর পয়সায় ড্রিংক করে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বিজন সেন বললেন খানিক আগে দু'বার আপনার বাড়িতে টেলিফোন করেছিলুম। একটা খবর যাচাই করবার জন্যে। কিন্তু বাড়ি থেকে কোন জবাব পেলুম না। তাই অলিম্পিয়া বারে এলুম। কিন্তু এখানে আপনাকে দেখতে পাবো ভাবিনি।

হঠাৎ আমার মত পরিবর্তন হলো। মনে মনে বিজন সেনের বুদ্ধির তারিফ করলুম। লোকটা বুদ্ধি খরচ করে আমার খোঁজ করেছিলো। আমাকে একেবারে ভুলে যায়নি।

দরকারটা কী শুনি? আমার প্রশ্নে রুক্ষতা ছিলো।

'মনের মুকুট' পড়েছেন?

পুরানো প্রশ্ন। আবার মনটা বিষিয়ে গেলো।

আমি এবার সোজা বিজন সেনের মুখের দিকে তাকালুম, মনে মনে ভাবলুম লোকটা আমাকে এই প্রশ্ন করছে কেন? বিজন সেন কী জানতে চান?

আমি জবাব দিলুম, পড়েছি। রাবিশ উপন্যাস।

কিন্তু সম্প্রতি বইটি বাজারে হিট করেছে।

পশ্চিমবাংলার জনমতের উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই।

বিজন সেন যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন : বেশ বলুন বইটির দুর্বলতা কোথায়?

বিজন সেনের এই জেরাবন্দী আমার ভালো লাগলো না। লোকটা এতো প্রশ্ন করছে কেন? কিন্তু তবু সংবাদিকের কথার একটা জবাব দিতে হবে।

বললুম নায়িকার চরিত্র দুর্বল। আমার মনে হয়না কোন মেয়ে এতো ফ্লার্টারি করতে পারে।

বিজন সেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন খবরটি শুনেছেন কিনা জানিনে। কালীতারা ফিল্মস, মানে প্রডিউসার বি পাল বইটির চিত্রস্বত্ব কিনে নিয়েছেন। শিগ্‌গির শুটিং শুরু করবেন। বইটির পরিচালনার ভার নিয়েছেন বিখ্যাত ডিরেক্টর অমিত গুপ্ত। আর নায়িকার রোল কাকে দেয়া হয়েছে জানেন? আপনার স্ত্রী, সেক্সকুইন রাধা বোসকে।

বিজন সেনের কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম লোকটা বলছে কী; আজ সকালে আমি প্রডিউসার বিনোদ পালকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। তাকে গালাগালিও করেছি। বলেছি মনের মুকুট বইতে আমার স্ত্রী অভিনয় করতে পারে না। বিনোদ পালকে বলেছিলুম যে, রাধা বোস ইজ মাই ওয়াইফ, এ রেসপেক্টেড লেডী বাট নট এ গার্ল ফ্রম দি স্ট্রীট···উনি আপনার বইতে অভিনয় করবেন না। আর এখন বিজন সেন বলছেন যে, আমার স্ত্রী মনের মুকুট বইতে অভিনয় করবেন। লাই, বিগ লাই।

প্রতিবাদ করলুম। বললুম : ভুল খবর শুনেছেন।

আজ সকালে প্রডিউসার বিনোদ পাল আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে তাঁরা মনের মুকুটের হিরোইনের রোলে আমার স্ত্রীকে নিতে চান। আমি তাঁর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

আপনার খবর বাসী এবং পুরানো। আমি এইমাত্র কালীতারা ফিল্মস্ স্টুডিও থেকে আসছি। ডিরেক্টর অমিত গুপ্ত আমাদের সবাইকে ডেকে বললেন, তিনি "মনের মুকুট" বইটি পরিচালনা

করবেন। আর রাধা বোস এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন। অমিত গুপ্তের সঙ্গে প্রডিউসার বিনোদ পালও ছিলেন। তিনি আপনার সঙ্গে সকালে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তার আভাস দেননি।

আমরা শুধু বলেছি যে রাধা বোস অমিত গুপ্তকে কথা দিয়েছেন যে তিনি "মনের মুকুট" বইতে অভিনয় করবেন। এই সপ্তাহে এইটে হলো সবচাইতে বড়ো সংবাদ। স্টপ প্রেস নিউজ।

বিজন সেনের মুখে এতোগুলো কথা জেনে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো। তাহলে গোপনে গোপনে অমিত গুপ্ত আমার স্ত্রীর সঙ্গে মনের মুকুট বই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। শুধু কী তাঁরা বই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন না—অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিশ্চয় আমার স্ত্রী অমিত গুপ্তের সঙ্গে গোপনে প্রেম করছেন। বাজারের গুজবের কথা আমার মনে হলো। রাধা বোস তাঁর স্বামীকে ডিভোর্স করে অমিত গুপ্তকে বিয়ে করবেন। ব্যাপারটা এতোদূর গড়িয়েছে!

আরো কিছু চিন্তাধারা আমার মনের মধ্যে এসে জড়ো হলো। পাড়ার ছেলেদের কাছে শুনেছিলুম, প্রতিদিন বিকেল পাঁচটার সময় অমিত গুপ্তের গাড়ি এসে আমার বাড়ির কাছে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে আসেন অমিত গুপ্ত আর আমার স্ত্রী। ওরা দুজনে বাড়িতে ঢোকেন।

তারপর···

না না বাকিটা চিন্তা না করাই ভালো। মুহূর্তের জন্যে আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে বড়ো নীচু ধারণা হলো।

কিন্তু আমার রাগটা গিয়ে পড়লো বিজন সেনের উপর।

ওর উপর আমি মনের ঝাল মেটালুম। আমি এবার একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলুম। আমার গ্লাসের হুইস্কির খানিকটা বিজন সেনের মুখের উপর ছিটিয়ে দিলুম।

বললুম লোফার। ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা করে না। আমার স্ত্রীকে নিয়ে কথা বলতে হলে তাঁর সম্মান নিয়ে কথা বলবেন। মনের মুকুটের মতো সস্তা বইতে আমার স্ত্রী

কখনই অভিনয় করতে পারেন না।

আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে বারের সবাই আমাদের মুখের দিকে তাকালো। তারপর যখন বিজন সেনের মুখের উপর হুইস্কি ঢেলে দিলুম তখন সবাই বুঝতে পারলো যে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। সালিশী করবার জন্যে দু'একজন আমাদের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো।

বিজন সেন প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর নিজের মুখ মুছতে মুছতে বললেন ঃ যদি মনে করে থাকেন যে আপনার স্ত্রী 'দেবী' তাহলে ভুল করবেন। মনে রাখবেন যে এক গণিকার পার্ট করেই আপনার স্ত্রী চিত্রজগতে নাম কিনেছিলেন। সেই তুলনায় মনের মুকুটের নায়িকা তো সামান্য ফ্লার্ট গার্ল।

এই বলে বিজন সেন গট্‌গট্‌ করে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বারের সবাই বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার তাদের আসর জমিয়ে বসলো।

আমি এবার শরীরে একটা যন্ত্রণা উপলব্ধি করলুম। এ দেহের যন্ত্রণা নয়, হৃদয়ের ব্যথা নয়, এ হলো চিন্তা ধারার যন্ত্রণা।

একটু বাদে বয় এসে আমার হুইস্কির গ্লাসে আরো খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিয়ে গেলো।

আমি বসে বসে সমস্ত ঘটনা ভাবতে লাগলুম। এবার আমি কী করবো ? বিজন সেন যে কথা বলেছেন সে কথাগুলো কী সত্যি ? সত্যিই কী আমার স্ত্রী মনের মুকুট বইতে সামান্য ফ্লার্ট গার্লের রোলে অভিনয় করবেন।

অসম্ভব। ইমপসিবল্‌।

আমার বিনানুমতিতে আমার স্ত্রী কী করে মনের মুকুট বইতে অভিনয় করবেন ? না, আমি হলুম তাঁর স্বামী, তাঁর বিজনেস ম্যানেজার। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার স্ত্রী কোন বইতে অভিনয় করতে পারেন না।

কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হলো আমার স্ত্রী সামান্য অভিনেত্রী

ন'ন। আজ তিনি পশ্চিমবাংলার সব চাইতে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী। দেশের সমাজে, সর্বস্তরে তাঁর সম্মান প্রতিপত্তি আছে। আজ রাধা বোসকে দেখলে রাস্তায় লোকে ভীড় করে দাঁড়ায়। আমার স্ত্রীর মান প্রতিপত্তির তুলনায় সমাজে আমার কোন মূল্য বা স্থান নেই।

আজ স্ত্রীর গৌরব নিয়ে আমি বেঁচে আছি। তাঁকে শাসন করবার কিংবা হুকুম দেবার আমার কোন অধিকার নেই। আজ যদি আমার স্ত্রী আমার নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে আমি কী করবো?

না, আমি কিছুই করতে পারবো না। আজ আমার কাছে শুধু একটি পথ খোলা আছে।

আমি আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে পারি।

ডিভোর্স!

এ কী কথা বলছি!

এই ধরনের চিন্তা করাও যে পাপ। ডিভোর্স করলে আমার সমস্যার সমাধান হবে না।

আমি ডিভোর্স করলে আমার স্ত্রী যদি অন্য কাউকে বিয়ে করেন তাহলে আমি কী করবো? আমি কোন প্রকারে আমার স্ত্রীকে অন্য কারু শয্যাশায়িনী হতে দিতে পারিনে।

শুধু কী তাই?

বাজারের গুজব যে আমার স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স করে অমিত গুপ্তকে বিয়ে করবার পরিকল্পনা করছেন।

ইম্‌পসিবল্‌!

'সুপ্রকাশ'!

একী তুমি পাগলের প্রলাপ করছো। খবরদার, তুমি রাধাকে ডিভোর্স দিওনা…তাহলে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

আমি কী করবো?

বার বার শুধু একটি কথাই আমার মনে জাগতে লাগলো, ভ্রষ্টা বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে নিয়ে আমি কী করতে পারি?

আমার কাছে শুধু একটি পথ খোলা আছে।

খুন…মার্ডার।

এ কী কথা আমি বলছি ?

কাকে খুন করবো ?

আমার স্ত্রীকে ? কীল মাই ওয়াইফ···এতোদিন যে আমার শয্যাসঙ্গিনী ছিলো আজ সে হলো দু'চোখের বিষ।

উত্তেজনায়, চিন্তায় আমি খুব জোরে গ্লাসটি চেপে ধরেছিলুম। হঠাৎ কাঁচের গ্লাসটি মট্‌মট্‌ করে আমার হাতে ভেঙে গেলো।

হাতের বেশ খানিকটা কেটে গেলো। বয় ছুটে এলো।

স্যার, আপনার হাতে রক্ত।

আমি রক্তের দিকে তাকালুম না।

আমার মাথায় খুনের নেশা চেপেছে। কাকে খুন করবো ?

আমার স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীকে ?

দ্বিতীয় স্বামী ! অসম্ভব ! আমি জীবিত থাকাকালীন রাধা বোস আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না।

অতএব আমার কাছে সহজ এবং সরল পথ হলো আমার স্ত্রীকে হত্যা করা।

মার্ডার ইয়োর ওয়াইফ।

আপনারা নিশ্চয় রাধা বোসের যৌবন পরিপূর্ণ দেহটি দেখেছেন ! তাঁর সুন্দর চোখ, মিষ্টি ঠোঁটটি আপনি নিশ্চয় ভোলেননি। তাঁর শিশুসুলভ কচি মুখ সদা সর্বদাই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কিন্তু যে নিষ্পাপ মুখটি আপনার হৃদয়কে আকর্ষণ করছে সেই সুন্দর মুখ আমাকে পুড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্বাস করুন আমি চাই ঐ সুন্দর সরল মুখকে আপনি আর না দেখতে পান।

রাধা বোসের দেহ নিস্পন্দ হয়ে যাবে···কণ্ঠস্বর নিস্তেজ নির্বাক হবে।

আপনি বলবেন, রাধা বোসের মৃত্যু হয়েছে।

আর আমি বলবো, রাধা বোসকে আমি খুন করেছি।···

সেদিন অনেক রাত্রে আমি বাড়ি ফিরলুম। বাড়িতে যখন ফিরে এলুম তখন আমি বদ্ধ মাতাল।

হয়তো ঘরে ঢুকবার সময় আমি গুন গুন করে গান করেছিলুম। মনের আনন্দে না নিজের মনের দুশ্চিন্তাকে ভুলবার জন্যে জানিনে।

অনেক মদ গিলবার পর আমার মাথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো।

ঘরে ঢুকবার সময় আমার অলিম্পিয়া-বারের কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

বিজন সেন চলে যাবার পর নিজের টেবিলে আমি একাই বসেছিলুম।

বার-বার বিজন সেনের কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো। শুনুন মশায় যদি মনে করে থাকেন আপনার স্ত্রী 'দেবী' তাহলে ভুল করবেন।

তাহলে কী আমার স্ত্রীর চরিত্র ভালো নয়।

আমরা অসংযমী জীবনধারাকে বলে থাকি অসৎ চরিত্র।

আচ্ছা আমার স্ত্রী, কী তাঁর পরিচয় ?

কী তাঁর অতীত ;

তাঁর জীবনের কিছুই আমি জানিনে।

ভ্রষ্টা, অবিশ্বাসী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বহু কাহিনী ইতিহাসে আছে।

এই ধরনের স্ত্রীকে স্বামীরা হত্যা করেছেন তার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। সম্রাটরা রাজা-বাদশারা যদি স্ত্রীকে হত্যা করে থাকতে পারেন তাহলে আমি কেন আমার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারবো না।

লেখকরা তাঁদের নাটক নভেলে প্রায়ই নায়িকাকে হত্যা করে থাকেন।

আমি লেখক, অমি বাস্তব জীবনে আমার স্ত্রীকে হত্যা করবো।

মার্ডার মাই ওয়াইফ···মার্ডার মাই ওয়াইফ···

বার বার একটি কথা আমার মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগলো।

আর এই সব কথা চিন্তা-ভাবনা করে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

মার্ডার করার পর আমার যা হয় হোক।

এখন আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করতে চাই না।

মার্ডার মাই ওয়াইফ···মার্ডার মাই ওয়াইফ···

বেয়ারা ডবল পেগ লে আও।

দিশী নয় পিয়োর স্কচ।

আমার অর্ডার শুনে বেয়ারা টেবিলে হুইস্কি রেখে গেলো। এক চুমুকে গ্লাসের হুইস্কিটুকু শেষ করলুম।

আউর একঠো···

আমার স্ত্রীকে খুন করবো।

আমার মাথায় আবার দুর্বুদ্ধি জাগলো। প্রতি মিনিটে মদ গিলছি···আর শুধু এই কথাটি ভাবছি···

কিন্তু খুন করার কথা চিন্তা করবার সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো।

এ কী কুচিন্তা করছি ?

আমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছি।

না না মাতাল হয়ে গেছি।

এই নিয়ে প্রায় দশ পেগ হুইস্কি গিলেছি। হাফ্ এ বোটল···

বেয়ারা আউর একঠো···

নাঃ না অতো সহজে আমি মাতাল হইনা।

দশ পেগ তো আমার কাছে নস্যি।

আমার স্ত্রীকে খুন করবো।

আবার আমার মনে এই কথাটি জাগলো।

গেট আউট, গেট আউট···গেট আউট, তুমি কে, বার বার আমাকে এই শয়তানী বুদ্ধি দিচ্ছো···তুমি কে আমাকে কু-পরামর্শ দিচ্ছো যে তোমার স্ত্রীকে হত্যা করো !

আমি নিঃশব্দে হুইস্কির গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখলুম।

তারপর তাড়াতাড়ি গ্লাসটি রুমাল দিয়ে মুছলুম।

সর্বনাশ ঐ গ্লাসের ভেতর যদি আমার আঙুলের ছাপ থাকে তাহলে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

পুলিশ !

পুলিশের কথা ভেবে আমি চমকে উঠলুম। তাহলে পুলিশ কী আমায় থানায় নিয়ে যাবে।

হয়তো আমার সাজা হবে জেল কিংবা ফাঁসি···

বেয়ারা আউর একঠো পেগ লে আও।

আলিম্পিয়া বারে বসে আমি এই ধরনের চিন্তা করছিলুম।

ইতিমধ্যে বারের ভেতর কতো লোক এলো গেলো তার হিসেব রাখিনি।

অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবানা করবার পর আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো।

তারপর আমি বাড়ি ফিরে এলুম কিন্তু আমার মনের চিন্তাধারাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলুম না যে, আমার স্ত্রী চরিত্রহীনা?

কী তাঁর অতীত কী তাঁর পরিচয়? ভ্রষ্টা, অবিশ্বাসী, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্তর আছে। এই ধরনের স্ত্রীকে স্বামীরা হত্যা করেছেন তারও প্রমাণ যথেষ্ট আছে। সম্রাটেরা, রাজ-রাজারা যদি স্ত্রীকে হত্যা করে থাকতে পারেন তাহলে আমি কেন আমার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারবো না।

হত্যা! মার্ডার।

সে রাত্তিরে আমি এই কথা ভেবে আর ঘুমুতে পারলুম না।

*　　　*　　　*

পরের দিন আমার ঘুম ভাঙলো প্রায় এগারটার সময়। সোনালি রোদ্রে আমার বেডরুম ভরে গেছে। বিছানার পাশে তাকিয়ে দেখলুম আমার স্ত্রী নেই, বুঝতে পারলুম আজ সকালে আমার স্ত্রী শুটিংএ গেছেন।

এবার গতরাত্রের ঘটনাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করলুম।

প্রথমে মনে পড়লো যে, গতরাত্রে আমি প্রচুর মদ গিলেছিলুম। আমার মাথার শিরাগুলো এখনও দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। মাথা পরিষ্কার করবার জন্যে আমি দু'একটা আলফা সলিজারের বড়ি খেলুম।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার একটা কথা মনে পড়লো।

সর্বনাশ!

আমি মনে মনে কী চিন্তা করেছিলুম। শুধু চিন্তা নয়, মুখেও এই কথা মৃদুস্বরে বলেছিলুম। বলেছিলুম আমার স্ত্রীকে হত্যা করবো।

কেউ আমার মনের কথা জানতে পারেনি।

হঠাৎ স্ত্রী হত্যার কথা কেন ভেবেছিলুম। কী কারণ ?

কারণ আমার স্ত্রী অবিশ্বাসী, ভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা।

কাল মদের ঘোরে যে সব অবাস্তব কথা ভেবেছিলুম আজ সুস্থ মনে সেই কথা ভাবতে লাগলুম।

মার্ডার ইয়োর ওয়াইফ।

পশ্চিমবাংলার দর্শকেরা রাধা বোসকে ভালোবাসেন কিন্তু আমি তাঁকে ঘৃণা করি।

আই হেট হার।

না, একদিন আমি তাঁকে ভালোবাসতুম। কিন্তু আজ আমার মন থেকে সব ভালোবাসা দূর হয়ে গেছে।

আপনারা জেনে রাখুন আজ আমার স্ত্রী আমার হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেছেন। তিনি শুধু পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয়া অভিনেত্রী গ্ল্যামার গার্ল সেক্সকুইন রাধা বোস। আমার সঙ্গে তাঁর দেহের কোন সম্পর্ক নেই। হৃদয়ের সম্পর্ক তো নেই-ই…

* * *

সেদিন দুপুর থেকে আমার মনে এক নতুন চিন্তা এলো।

প্ল্যান টু মার্ডার মাই ওয়াইফ। কী করে স্ত্রীকে হত্যা করা যায়—

বার বার একই কথা ভাববার পর আমার চিন্তাধারা আরো পরিষ্কার স্বচ্ছ হলো। আর যতোই এই কথা নিয়ে ভাবতে লাগলুম ততোই যেন আমার খুন করবার ইচ্ছে প্রবল হলো।

কীল হার, মার্ডার হার।

ঠিক করলুম এবার থেকে স্ত্রীর উপর নজর রাখতে হবে।

আমি জানতে চাই আমার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারা ? ওঁর বন্ধু বান্ধবদের নাম জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো।

সারাদিন আমার স্ত্রীর জন্যে বিস্তর টেলিফোন আসতো।

টেলিফোন করতো স্তাবকের দল; ফিল্ম প্রডিউসার এবং ডিরেক্টরের দল। ওরা টেলিফোনের হাতল তুলেই বলতেন যে, আমরা রাধা বোসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আগে এই সব টেলিফোন পেলে আমি গর্ব অনুভব করতুম। আমি রাধা বোসের স্বামী এ কথাটা ভেবে আনন্দ অনুভব করতুম। হাজার হোক আমার স্ত্রী দেশের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। কিন্তু এবার থেকে আমার আর একটি কথা মনে হতে লাগলো। আমি সুপ্রকাশ, বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা লেখক, বুদ্ধিজীবী তাই আজকাল যুবক প্রডিউসার ডিরেক্টরের টেলিফোন পেলে আমার মনে কিছুটা ঘৃণা কিছুটা হিংসে হতো।

কখনও কখনও আমার স্ত্রী এই সব টেলিফোনের জবাব দিতেন। আমি আড়াল থেকে ওর কথাবার্তা শুনতুম। আর সুবিধে পেলেই আমি এসব টেলিফোন ধরতুম। জানবার ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা হতো আমার স্ত্রীকে কে টেলিফোন করছে।

আর একটি জিনিসের উপর আমি তীক্ষ্ন নজর রাখতুম। চিঠি।

আমার স্ত্রীর কাছে হাজার পত্রগুচ্ছ আসতো। কিন্তু কোন চিঠি খুলে পড়বার মতো আমার মনের সাহস ছিলো না। চিঠিগুলো সব আমার স্ত্রী খুলে পড়তেন। কখনও কখনও স্তাবকদের দু'একটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলতেন চিঠিটার একটা জবাব দিয়ে দাও।

এবার থেকে আমার আচার ব্যবহারও পরিবর্তন হলো।

কোন বিষয় নিয়ে আমি স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতুম না।

বলতে গেলে আমি স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করলুম। তার সঙ্গে স্টুডিও যেতুম না। স্টুডিওতে যাবার কথা শুনলে আমি তাঁকে এড়িয়ে যেতুম।

'আগে আমি স্ত্রীর কণ্ট্রাক্ট কিংবা শুটিংয়ের ডেটের হিসেব নিজেই রাখতুম। কিন্তু এবার থেকে এই কাজে গাফিলতি করতে লাগলুম। সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আমি একটি ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত রইলুম। আমি ভাবতে লাগলুম কী করে আমার স্ত্রীকে

খুন করা যায়।

কিন্তু মানুষ খুন করা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিলো না। সেই জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে আমি বিভিন্ন ধরনের বইপত্তর পড়তে লাগলুম। আর পড়তে লাগলুম আইন আদালতের খুনের মামলার পূর্ণ বিবরণী এবং সাক্ষীর জবানবন্দী। স্ত্রী হত্যার অনেক বিবরণী এই আইন আদালতের কেসের ভেতর পড়তে পেলুম। আর এই সব ঘটনার ভেতর একটি সামঞ্জস্য দেখতে পেলুম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর চরিত্রকে সন্দেহ করে তাদের খুন করা হয়েছিলো। কয়েকটা ঘটনার ভেতর দেখতে পেলুম যে স্ত্রী ছিলো স্বামীর পরকীয়া প্রেমের পথের কাঁটা। আর পথের কাঁটা দূর করবার জন্যে এইসব স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছিলো।

কিন্তু, আমার স্ত্রী তো আমার পথের কাঁটা নয়, বরং···ঠিক তার উলটো। আজ আমিই হয়েছি স্ত্রীর যথেচ্ছারিতা প্রেমের প্রতিবন্ধক। বাজারের গুজব, তিনি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চান—আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

সব বইপত্তর লুকিয়ে পড়তুম। কেউ যেন জানতে না পারে আমি কী বই পড়ছি। ঘুণাক্ষরেও যদি কেউ টের পায় যে সাহিত্যিক সুপ্রকাশ খুন-সংক্রান্ত বই পড়ছে তাহলে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে। সবাই জানতে চাইবে সুপ্রকাশ ক্রাইমের বই পড়ছে কেন?

*　　　*　　　*

বই, আইন আদালতের কাগজপত্র পড়ে একটি জিনিস বুঝতে পারলুম যে খুন করতে হলে আমাকে দুটো জিনিস করতে হবে। প্রথমত খুনের কোন সাক্ষী থাকবে না। দ্বিতীয়ত 'এলিবি' যোগাড় করতে হবে। 'এলিবি' মানে আপনারা যাকে বলেন শিখণ্ডী। আর নিখুঁত খুন হলো যে খুন কারু মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করবে না। অর্থাৎ সবাই ভাববে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হলো স্বাভাবিক মৃত্যু—ন্যাচারাল ডেথ। আর এই কাজটি করতে হলে খুন করে খুনের দোষ অন্যের কাঁধে চাপাতে হবে।

তাই আমি চিন্তা করতে লাগলুম কী করে একটা নিখুঁত খুন

করবো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অলিম্পিয়া বারে গিয়ে বসতুম আর মদের গ্লাস নিয়ে ভাবতুম কী করে রাধাকে খুন করা যায়। বিষ খাওয়ানো …না বিষ খাইয়ে খুন করা অতি গতানুগতিক পন্থা…সবাই বলবে স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। কারণ স্ত্রী স্বামীর পরকীয়া প্রেমে বাধা দিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে বাজারের আর একটি গুজব আমার কানে এলো। শুনতে পেলুম যে ডিরেক্টর অমিত গুপ্ত আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করেন আর বেশ রাত্তিরে তাঁর বাড়িতে ফিরে যান।

এবার আমার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো ওরা কী ধরনের গল্প করেন?

শুধু কী নিছক গল্প করেন না প্রেম করেন! কী ধরনের প্রেম! একবার ভাবলুম যে ওদের এই প্রেম নিছক বাক্যালাপে আবদ্ধ নয়, না দৈহিক সম্পর্কও আছে? সত্যি যদি ওঁদের মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্ক না থাকে তাহলে অমিত গুপ্ত কেন ভোমরার মতো আমার স্ত্রীর চারপাশে ঘুরছেন।

এবার থেকে আমার মাথায় আর একটি নতুন চিন্তা এসে চাপলো। শুধু আমার স্ত্রীকে খুন করলে চলবে না…ডিরেক্টর অমিত গুপ্তকে সেই সঙ্গে খুন করতে হবে। ডবল মার্ডার।

আবার নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করলুম কী করে দু'জনকে একসঙ্গে খুন করা যায়? কাজটা দুরূহ। কারণ দু'জনকে একসঙ্গে পেতে হবে, একই সঙ্গে খুন করতে হবে। আর এমনভাবে খুন করতে হবে যেন কারো মনে কোন সন্দেহ না হয় যে, আমি এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছি।

আগেই বলেছি যে, শুনেছি কিছুদিন হলো অমিত গুপ্ত বিকেল-বেলা আমাদের বাড়িতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বসে সময় কাটাতেন। আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন যে, ওঁরা স্ক্রীপ্ট নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। আমি এই ব্যাপার নিয়ে তাঁকে কোন প্রশ্ন করিনি কিংবা তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা করিনি। কারণ কদিন বাদে যার মৃত্যু হবে সে যা খুশি করুক না কেন? আমি এই সন্ধ্যার সময়টা

অলিম্পিয়া বারে বসে সময় কাটাতুম। কিছুদিন হলো বেশ দেরি করে বাড়িতে ফিরতুম। ইচ্ছে করেই দেরিতে বাড়ি ফিরতুম। যেন ও'দের মনে কোন সন্দেহ না হয় যে আমি ও'দের দুজনকে সন্দেহের চোখে দেখছি।

* * *

একদিন হঠাৎ আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। ঠিক করলুম যে ডবল মার্ডার মানে অমিত গুপ্ত এবং আমার স্ত্রীকে একসঙ্গে খুন করতে হলে আমাকে বোমা ব্যবহার করতে হবে। আর এক বোমাতে দুজনকে খুন করতে হবে।

বোমার কথা শুনে আপনারা নিশ্চয় তাজ্জব বনে যাচ্ছেন। আজকাল তো সব ব্যাপারে বোমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলের চাইতে বোমাই বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যে ধরনের খুনের পরিকল্পনা করেছি তার জন্যে সাধারণ বোমা ব্যবহার করলে চলবে না···টাইম বোম্বা ব্যবহার করতে হবে। আর সেই টাইম বোমা ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ফাটাতে হবে।

চমৎকার আইডিয়া।

আর এই পরিকল্পনাটি আমার নিজস্ব নয়। আমার মনে হয় গল্পটি জেমস্ হেডলী চেজের। আলফ্রেড হিচককের একটি গল্পে এই ধরনের খুনের কাহিনী পড়েছিলুম। আমি সেই কাহিনীর খানিকটা অদলবদল করলুম। ঠিক করলুম যে, বোমা ফাটাবার জন্যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করতে হবে। আর টাইম ঠিক করবার জন্যে একটি ছোট অ্যালার্ম ক্লক ব্যবহার করতে হবে। অ্যালার্ম ক্লক ইলেকট্রিসিটিতে চলবে···নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠবে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বোমা প্রচন্ড শব্দ করে ফেটে উঠবে।

বেশ কয়েকদিন ধরে আমি ইলেকট্রিসিটি পরিচালিত টাইম বোমা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করলুম। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমার চিন্তাধারা যেন আরো পরিষ্কার হলো।

আমি হিসেব করে দেখেছিলুম যে, আমার স্ত্রী সাধারণত পাঁচ-টার সময় স্টুডিও থেকে বাড়ি ফেরেন। কারণ উনি স্টুডিও কিংবা আউটডোরে সন্ধ্যার পর কোন শুটিং করেন না। আর এ বিকেল

বেলা অমিত গুপ্ত আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ি ফেরেন। কোনদিন হয়তো ওঁদের বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। সোয়া পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা কিংবা পোনে ছটার সময় ওঁরা বাড়ি ফেরেন।

আমি মনে মনে আবার পরিকল্পনা করলুম যে, ছটার সময় ওঁরা যখন প্রেমে মশগুল থাকবেন তখন আমি বোমা ফাটাবো। অর্থাৎ ঠিক ছটার সময় ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠবে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফেটে উঠবে।

কিন্তু আমার প্রধান চিন্তা হলো বোমাটি কোথায় রাখবো ?

এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন বোমা ফাটলে আমার স্ত্রী এবং অমিত গুপ্তের নির্ঘাৎ মৃত্যু হয়।

হঠাৎ বোমা রাখবার একটি জায়গার কথা আমার মনে হলো। আমি জানতুম যে বাইরের বসবার ঘরে সোফাসেটিতে বসে আমার স্ত্রী এবং অমিত গুপ্ত প্রেমালাপ করেন। সোফাসেটির পেছনে আমাদের স্টোর রুম। ঐ ঘরে যাবার দরজা ঠিক সোফাসেটির পেছনে। বোমাটি ঠিক দরজার পেছনেই রাখবো। তাহলে বোমার অস্তিত্ব আমার স্ত্রী কিংবা অমিত গুপ্ত জানতে পারবেন না। দরজাটা বন্ধ থাকবে। আর যেই বোমা ফাটবে তখন দরজার দেওয়াল ভেঙে সোফাসেটির উপর পড়বে। হয়তো বোমার প্রচণ্ড আঘাতে সোফাসেটিও ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এবার মৃত্যু অনিবার্য। এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়লো— স্টোর রুমেই আমাদের ইলেকট্রিসিটির মেন সুইচ। ঐ সুইচ থেকে আলার্ম ঘড়িতে কানেকশন নেবো আর ঘড়িটার সঙ্গে বোমার কানেকশন থাকবে। অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ঘড়ি চালাবো আর বোমা ফাটাবো।

চমৎকার প্ল্যান।

আমার খুনের ভেতর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে না। এবার আমাকে খুনের জন্যে এলিবি মানে শিখণ্ডী যোগাড় করতে হবে। অর্থাৎ এই খুন যে পলিটিক্যাল মার্ডার কিংবা চোর ডাকাত করেছে এইটেই আমাকে প্রমাণ করতে হবে।

চোর ডাকাত !

দি আইডিয়া।

আমার মাথায় আর একটি বুদ্ধি এলো। পাঁচটার সময় আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরবেন। ঠিক পাঁচটার খানিকটা আগে আমি দরজার পেছনে বোমা রেখে আসবো আর মেন সুইচের সঙ্গে ঘড়ির এবং বোমার কানেকশন করে দেবো। আর পোনে পাঁচটার সময় ঠিক আমার স্ত্রী বাড়িতে পৌঁছুবার আগে একটি চুরি কিংবা ডাকাতির বন্দোবস্ত করে আসবো। চোরের কাজ হবে বাড়ির জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয়। দুর্ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারবে যে চোর আমার বাড়িতে এসেছিলো এবং বাড়িতে চোরই বোমাটি রেখে এসেছিলো।

নিখুঁত পরিকল্পনা। না কোথাও কোন ভুল ত্রুটি নেই।

* * *

কয়েকদিন ধরে আমার প্ল্যান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলুম।

প্রতিদিনই আমার মাথায় নতুন নতুন বুদ্ধি আর প্ল্যান গজাতে লাগলো।

একদিন ভাবলুম শুধু আমার স্ত্রীকে হত্যা করলে চলবে না। স্ত্রী হত্যা করে ইন্সিওরেন্স কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু পয়সা রোজগার করতে হবে। তাই ঠিক করলুম আমাদের দু'জনের নামে একটি জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্স করতে হবে। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী টাকা পাবে এবং স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী টাকা পাবে। সাধারণ ইন্সিওরেন্স করবো না। এ্যাকসিডেণ্ট রিস্ক কভার করতে হবে।

কিন্তু জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্স করতে হলে স্ত্রীর সই চাই।

অতএব দু-একদিনের জন্যে আবার আচার ব্যবহার পাল্টালুম। মুখটা মিষ্টি করলুম। হেসে হেসে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলুম।

একদিন স্ত্রীকে জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্সের কথাটা পাড়লুম।

আমার কথা শুনে আমার স্ত্রীর ভুরু তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

হয়তো আমার প্রস্তাব তাঁকে বিস্মিত করেছিলো। কী ব্যাপার? আমি জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্সের কথা বলছি কেন? কিন্তু তাঁর মনের

বিস্ময় ছিলো ক্ষণিকের।

কিন্তু তার মনের সন্দেহ সংশয় দূর করবার জন্যে এক গাল হেসে বললুমঃ আহা অতো চিন্তা-ভাবনা করছো কেন? ভবিষ্যতের কথাতো আর বলা যায় না। ডবল রিস্ক কভার করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। একজনের মৃত্যু হলে আর একজন টাকা পাবে।

কতো টাকার ইন্সিওর করবে? আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

পাঁচ লাখ—আমি জবাব দিলুম। পাঁচ লাখ! এই কথা যেন আমার স্ত্রী বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

স্ত্রীর মনকে বোঝাবার জন্যে বললুমঃ ফিল্ম আর্টিস্টের জীবন হলো অনেকটা জলের বুদ্‌বুদের মতো। আজ বাজারে খ্যাতি আছে কাল হয়তো কেউ চিনতে পারবে না। ভবিষ্যৎ-এর জন্যে কিছু গুছিয়ে রাখা ভালো।

আমার স্ত্রী আর কোন জবাব দিলেন না। পরের দিন ইন্সিওরেন্সের কাগজপত্র নিয়ে এজেন্টের কাছে গেলুম।

পাঁচ লাখ টাকার ইন্সিওরের কথায় এজেন্ট আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বিখ্যাত ফিল্ম স্টার রাধা বোসের জীবনবীমা করতে পারা তো পরম সৌভাগ্যের কথা।

নির্বিঘ্নেই ইন্সিওর হয়ে গেলো।

ইন্সিওর হবার পর আমি মার্ডার প্ল্যান কার্যকরী করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলুম।

আমার প্রথম চিন্তা হলো কোথায় তেজী বোমা পাওয়া যায়। কিন্তু বাজার থেকে বোমা কেনার অনেক অসুবিধে ছিলো। পুলিশ জানতে পারবে তাই ঠিক করলুম নিজের হাতেই বোমা তৈরি করবো।

কী করে বোবা তৈরি করা যায় এই নিয়ে বিস্তর বইপত্তর পড়তে লাগলুম।

ওষুধের দোকান থেকে বেনামীতে এসিড কিনলুম। তারপর যেই গিন্নী স্টুডিওতে চলে যেতেন অমনি ছাদে গিয়ে বোমা তৈরির মহলা চলতো।

বোমা তৈরি করার বেশি সময় ছিলো না। কিন্তু সাধারণ বোমা

বানালে চলবে না। টাইম বোমা বানাতে হবে।

এই টাইম বোমা বানাতে আমাকে বিস্তর মেহনৎ করতে হলো।

তারপর বোমা ঘড়িতে লাগালুম। দেখতে পেলুম ঘড়িটা ঠিক ঠিক কাজ করছে। তারপর যেই ঘড়ির কাঁটা সময়ের ঘরে পেঁছুল অমনি বোমাটি দুম করে ফেটে উঠলো। বোমা ফাটার আওয়াজ এতো তীব্র হয়েছিলো যে পাড়া প্রতিবেসীরা আতঙ্কিত হয়ে আমাদের বাড়ির দিকে উঁকি মেরে তাকালেন। কী ব্যাপার? কী হলো ফিল্ম অ্যাকট্রেস রাধা বোসের বাড়িতে। যাঁরা জানবার কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের বললুম যে, একটা বড়ো বাল্ব ভেঙে গেছে। কিন্তু আমার এই জবাব ছিলো ভিজে জবাব। কারণ আমি তাঁদের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলুম যে, ওঁরা সহজে আমার কথাগুলো স্বীকার করে নিতে পারেন নি।

আমি এরপর শিখণ্ডী সংগ্রহ করতে শুরু করলুম। কোন সিঁধেল চোর যোগার করতে হবে। আর সেই সিঁধেল চোরের সাহায্য নিয়ে আমার বাড়িতে একটা ছোট চুরির বন্দোবস্ত করতে হবে।

শিখণ্ডী যোগার করা সহজ কাজ ছিলো না। কারণ আমি যে আমার স্ত্রীকে খুন করতে যাচ্ছি একথা মন খুলে কাউকে বলতে পারিনে। এমন লোককে আমার বাড়িতে চুরি করতে পাঠাতে হবে সে যেন আমার প্ল্যানের কিছুই না জানতে পারে। আর আমি যে এই চুরির কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছি একথাও কাউকে বলতে পারিনে।

আমার প্রথম চিন্তা হলো যদি চোর জিজ্ঞেস করে ব্যাপার কী বলুন তো?

আপনার বাড়িতে আমাকে চুরি করতে পাঠাচ্ছেন কেন?

আমি ঠিক করলুম যে, এই প্রশ্নের কোন জবাব আমি দেবো না। যদি চোর জানবার জন্যে খুব বেশি পীড়াপীড়ি করে তাহলে বলবো ইন্সিওরেন্স কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। বাড়িতে চুরি করলে কোম্পানি থেকে মোটা টাকা আদায় করবো। অবশ্য তাহলে চোরকে আমার কিছু মোটা টাকা দিতে হবে।

কিন্তু আমি কাউকে টাকা দেবার পাত্র নই। আমি হলুম সাহিত্যিক, সদা সর্বদাই আমার মাথায় নতুন প্ল্যান গজাচ্ছে। তাই আমি ঠিক করলুম যে, কাউকে ব্ল্যাকমেল করে তাকে বাড়িতে চুরি করতে পাঠাতে হবে।

আর এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার রাজেনের কথা মনে পড়লো। রাজেন ছিলো আমাদের গাড়ির পুরানো ড্রাইভার। পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে আমাদের বাড়িতে কাজ নিয়েছিলো। লোকটা আসলে ছিলো খুনী ডাকাত। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে ছিলো। এই খবরটি আমি জানতুম। আমি প্রথমেই রাজেনকে পুলিশের ভয় দেখালুম।

বললুম ঃ পুলিশ ব্যাংক ডাকাতদের খোঁজে এসেছিলো।

আমার কথা শুনে রাজেন বেশ অবাক হলো।

ব্যাপার কী ? আমি ওকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছি কেন ?

রাজেন জিজ্ঞেস করলো, বলুন তো স্যার আপনি আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন কেন ?

আমার হাতে সেদিনকার একটি খবরের কাগজ ছিলো। কাগজের প্রথম পাতায় ব্যাংক ডাকাতির একটা বড়ো খবর ছিলো। পুলিশ ডাকাতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে এই ছিলো প্রথম পাতার খবর।

কাগজ পড়েছ ? পুলিশ তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবছি পুলিশকে কি বলবো ?

আমার কথার ইঙ্গিত রাজেন বুঝতে পারলো। এবার বললো, ভণিতা না করে আপনার কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করে বলুন।

ডাকাতি করতে পারবে রাজেন ? ব্যাংক ডাকাতি নয়, বাড়িতে ছিঁচকে চুরি করতে হবে।

আমার প্রস্তাব শুনে রাজেন বেশ হকচকিয়ে গেলো। তার মুখের চাউনি দেখে বুঝতে পারলুম যে, রাজেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে নি। আমি কী পাগলের প্রলাপ বকছি ? কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারলো না যে আমি তাকে চুরি করবার জন্যে অনুরোধ করছি।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে রাজেনের বেশ খানিকটা সময় লাগলো।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো : হঠাৎ আমাকে চুরি করতে বলছেন কেন ? মতলবটা কী বলুন তো ? আমি তো চুরি ডাকাতি করা ছেড়েই দিয়েছি।

রাজেনের কথা বলবার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলুম যে লোকটা সহজে আমার প্রস্তাবে রাজী হবে না কারণ আমি জানতুম যে, রাজেন আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। কারণ কিছুদিন আগেও সে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো।

আমি একটু হেসে বললুম, এই পেশাটা যে তোমাকে আবার ধরতে হবে।

মাফ করবেন ! এই ধরনের কাজ আমাকে দিতে হবে না।

এই বলে রাজেন আমার দিকে তাকালো। তারপর দেখতে লাগলো আমি ওর কথার কি জবাব দিই।

আমি চট্ করে রাজেনের কথার কোন জবাব দিলুম না।

বেশ খানিকটা সময় নিঃস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে কেটে গেলো।

রাজেন আমার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, আসল কথা খুলে বলুন স্যার। আমাকে চুরি করতে বলছেন কেন ? আর কার বাড়িতে চুরি করতে বলছেন ?

ওর প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলুম। তারপর বললুম, ধরো যদি বলি আমার বাড়িতে করতে হবে।

কথাটা বলে আমি রাজেনের মুখের দিকে তাকালুম। দেখতে লাগলুম ওর মুখের ভাব পরিবর্তন হয় কিনা ?

আমার কথা শুনে রাজেন যেন আকাশ থেকে পড়লো।

আমি বলছি কী ?

সহজে বিশ্বাস করতে পারলো না যে আমি ওকে আমার বাড়িতে চুরি করতে বলছি। সত্যিই আমার প্রস্তাব অবিশ্বাস্য। পাগল ছাড়া এ ধরনের কথা কেউ কী বলতে পারে ?

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর রাজেন আবার বললো, কথাটা আর একবার বলুন তো ? ভালো করে শুনে নিই।

আমি এবার কৃত্রিম রাগত স্বরে বললুম, এই কথা বার বার বলবার

প্রয়োজন হয় না। তোমাকে আর নিজের হাতে চুরি ডাকাতি করতে বলছিনে। তোমার কোন চোর-সাগরেদ বন্ধুকে বলো, আমার বাড়িতে চুরি করে আসুক।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললুম, এর জন্যে তোমাকে কিছু পয়সাও দেবো।

রাজেন বিদ্রূপের সুরে বললো, মাফ করবেন। আর একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারছিনে—আপনার বাড়ি কিংবা সম্পত্তি কী চুরি ডাকাতির এগেনস্টএ ইন্সিওর করেছেন। না মেমসাহেবের গিল্টী করা গয়নাগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে ইন্সিওর কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবার ফিকিরে আছেন।

আবার আমি ধমক দিয়ে উঠলুম। রাজেন, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। আমি যা বলছি সে কাজ যদি না করো তাহলে পুলিশের কাছে তোমার কীর্তির কথা বলতে হবে।

আমার জবাব শুনে রাজেনের মেজাজও সপ্তমে চড়ে গেলো। সে একটু কর্কশ সুরে বললো, আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?

আমি মিষ্টি হেসে বললুমঃ ভাবছি তোমার বাড়ির ঠিকানা পুলিশকে দেবো কিনা ?

এবার রাজেনের সুর নরম হলো। বললো, আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেলিং করবার চেষ্টা করছেন !

রাজেনের কথা শুনে আমি হাসলুম। বললুম, আজ দুনিয়ার রং পাল্টে গেছে। এতোদিন ব্ল্যাকমেলিং করা তো তোমার একচেটে ব্যবসা ছিলো।

রাজেন বুঝতে পারলো আমার সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ হবে না। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, কবে নাগাদ আপনার বাড়িতে চুরি করতে হবে।

আজ থেকে সাতদিন বাদে। বিকেল পৌনে পাঁচটার সময় কাউকে আমার বাড়িতে পাঠাবে। তখন বাড়িতে কেউ থাকবে না।

বেশ, আপনার কথামতই কাজ করবো। ভবিষ্যৎ-এ আপনি আমাকে আর কোন কাজ করতে বলবেন না। চুরি করে আপনি ইন্সিওর কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছেন। এ কথাটা

আমার জানা রইলো। প্রয়োজন হলে আমিও একদিন আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারবো……।

এই বলে রাজেন চলে গেলো। আমি আর কিছু বললুম না।

মূর্খ রাজেন! ও কী জানে যে আমি ইন্সিওর কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছিনে। আমি যে আমার স্ত্রীকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছি।

আমি খুশি মনে বাড়িতে ফিরে এলুম।

*　　　　*　　　　*

আমার নাটক প্রস্তুত, স্টেজ তৈরি, নায়ক-নায়িকারা মেক্আপ করছেন। এবার শুধু ড্রপসিন তুললেই হলো।

সাতদিন বাদে খুন করবার দিন এলো।

সকাল থেকে আমি উত্তেজিত ও চঞ্চল বোধ করতে লাগলুম।

বাংলাদেশের বিখ্যাত ডিরেক্টর এবং চিত্রাভিনেত্রীকে খুন করা তো সহজ কথা নয়। আমি জানতুম বাজারে এই খুন নিয়ে বিস্তর আলোড়ন শুরু হবে। কাগজওয়ালারা আমার বউ-এর ছবি ছাপবে। আমার বউ-এর জীবন কাহিনী রসালো করে লিখবে—আর আমার কাছে বিবৃতি চাইবে। জিজ্ঞেস করবে এই খুন সম্বন্ধে আমার কি মন্তব্য? আমি কি বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলুম।

কী জবাব দেবো? বলবো আমাদের ভালবাসা শুকিয়ে গিয়েছিলো। না, না তাহলে লোকে সন্দেহ করবে যে, এই হত্যা-কাণ্ডের পেছনে আমার হাত আছে। ইমপসিবল। বরং আমি দু ফোটা জল ফেলে বলবো রাধাকে আমি ভালবাসতুম। আই লাভ হার! আমি খুনীকে ধরতে চাই।

আবার নিজের মনে মনে বললুম, বেশ নাটক করছি আমি! তাই না! স্ত্রীকে খুন করতে যাচ্ছি। আর এদিকে বলছি যে বউকে ভালবাসতুম।

নিজের মনে মনে আবার বললুম, রাধা বোস তুমি আমার স্ত্রী। সমাজের কাছে তোমার ঐ পরিচয়। কিন্তু আজ দশজনের কাছে তুমি ঐ পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করছো। তুমি নিজের নাম-দেহ বিক্রি করে সমাজে নাম কিনতে চেয়েছিলে। তুমি অবিশ্বাসী,

দুশ্চরিত্রা ভ্রষ্টা···আজ আমার কাছে তোমার কোন মূল্য নেই।

অমিত গুপ্ত, তুমি পশ্চিমবাংলার একজন খ্যাতনামা ফিল্ম ডিরেক্টর হতে পারো বটে কিন্তু তুমি কক্ষনো পরস্ত্রীর দিকে তাকিও না। আজ তোমার জীবনের শেষ দিন। নারী জাতটা দু'চোখ ভরে দেখে নাও। কাল তুমি আর এই সুন্দর সংসারকে দেখতে পারবে না। আর শুধু তাই নয়, দুনিয়া জেনে রাখুক পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিলে কী শাস্তি পেতে হয়।

* * *

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো।

আমার মনের উত্তেজনা বাড়লো।

আর কিছুক্ষণ বাদেই আমার নাটক শুরু হবে।

আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এলুম।

চাকর-বাকরদের আগে থেকে ছুটি দিয়েদিলুম। বাড়িতে কেউ নেই।

বাড়িতে ঢুকেই আমি স্টোররুমে ঢুকলুম। বসবার ঘরের পেছনেই স্টোররুম।

ঘরটা বিস্তর জঞ্জালে ভর্তি ছিলো। দরজার সামনে ছিলো একটা টেবিল তার উপর অ্যার্লাম ক্লক রাখলুম। অ্যার্লাম ক্লক ইলেকট্রিক প্লাগে কানেক্ট করলুম। তারপর দরজার পেছনে বোমাটি রাখলুম। বোমাটি ক্লকের সঙ্গে কানেক্ট করলুম।

স্টেজ তৈরি।

নাটক শুরু হলো।

তেজী শক্তিশালী বোমা। নিজের হাতে তৈরি করেছিলুম। ভালো দামী এসিড পুরেছিলুম।

আমি জানতুম যে বোমা ফাটলে শুধু দেওয়াল কেন গোটা বাড়িটা উড়ে যাবে।

এবার ঘড়িটা চালিয়ে দিলুম। ইলেকট্রিসিটিতে ঘড়ি চলবে। আর যেই ঘড়িতে ছটা বাজবে অমনি ধুম করে বোমা ফাটবে। পাশের দেয়াল ভেঙে পড়বে আর বোমা বিস্ফোরণে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হবে। না না রাধা বোসের মৃত্যু হবে। আমার স্ত্রী অনেকদিন

মারা গেছেন।

টিক টিক···

ঘড়ির শব্দ আজ ভারী মিষ্টি শোনাল

না, না এ ঘড়ির শব্দ নয়, মৃত্যুর সংকেত। ঘড়িটা সবেমাত্র চালিয়েছি অমনি খুট করে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম।

পায়ের শব্দ শুনে একটু বিস্মিত হলুম। পাঁচটার আগে তো আমার স্ত্রী বাড়ি ফেরেন না।

আজ সকাল সকাল স্টুডিও থেকে ফিরলেন কেন?

অমিত গুপ্ত কি ওর সঙ্গে আছেন?

হয়তো একটু বাদে ওরা দুজনে বিছানায় শুয়ে পড়বেন।

বাকিটা আমি চিন্তা করতে পারলুম না।

অসম্ভব! ইম্‌পসিবল।

আমার চোখের সামনে আমার স্ত্রী, না-না রাধা বোস যাকে আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি সে অন্যের সঙ্গে প্রেম করবে। না এ আমি কখনই সহ্য করতে পারিনে।

কিন্তু একটু বাদে নিজের ভুল বুঝতে পারলুম।

পায়ের শব্দ আমার স্ত্রী কিংবা অমিত গুপ্তের নয়। অন্য-কারোর পদধ্বনি। অপরিচিত কেউ আমার বাড়িতে ঢুকেছে।

হঠাৎ আমার রাজেনের কথা মনে পড়লো। হয়তো রাজেন তার লোক পাঠিয়েছে। কিন্তু ওরা এতো আগে এলো কেন?

এখনও পৌনে পাঁচটা বাজেনি। রাজেনকে তো বলেছিলুম যে পাঁচটার কিছু আগে ও যেন ওর সাগরেদদের আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু রাজেনের লোক কী করে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

নিশ্চয় পেছনের দেয়াল টপ্‌কে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে।

আমি এবার চিন্তায় পড়লুম। ওরা যে এতো শিগ্‌গির আমার বাড়িতে হানা দেবে কল্পনা করিনি। আমি এবার বাড়ি থেকে পালাই কী করে? সামনের ঘরে দরজার কাছে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ঐ পথ দিয়ে বাড়ি যাওয়া যায় না। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলুম যে ঘরে বসে আছি সেই ঘরে লুকিয়ে থাকাই হবে বুদ্ধি-

মানের কাজ।

এই সব কথা চিন্তা-ভাবনা করে আমার শরীর হিম হয়ে গেলো। বুঝতে পারলুম বড়ডো বোকামি করেছি। সাড়ে চারটার সময় আমার কাজ শেষ করা উচিৎ ছিলো। নিজের বোকামির কথা ভেবে অনুতাপ হলো। কিছুক্ষণের জন্যে আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি সব বন্ধ হয়ে গেলো। কী মুর্খামি করেছি।

হঠাৎ আমার কানে একটি কথা ভেসে এলো।

সে কিরে ফিল্মস্টার রাধা বোসের বাড়িতে গয়নাগাটি কিছুই নেই। আশ্চর্য!

আজকাল কী কেউ আর চুরি ডাকাতির ভয়ে মূল্যবান কোন জিনিস বাড়িতে রাখে? রাজেন শুধু শুধু আমাদের বেগার খাটিয়েছে। আমি এখনও বুঝতে পারছিনে রাজেন কেন শুধু আমাদের এই বাড়িতে ডাকাতি করতে পাঠাল।

দুটো ঘরতো খুঁজলুম। কিছুই পেলুম না। চল এবার পাশের ঘরটি খুঁজে দেখি। মনে হচ্ছে ওটা স্টোররুম। ঐ ঘরে হয়তো কিছু মাল পাওয়া যেতে পারে। প্রথম লোকটি বললো।

সর্বনাশ। পাশের ঘরে তো আমি লুকিয়ে আছি। আমি এই কথা চিন্তা করবার আগেই লোকদুটো আমার ঘরে ঢুকলো।

প্রথমে ওরা আমাকে দেখতে পেল না। আমি দরজার সামনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিলুম। কোন আওয়াজ, চীৎকার এমন কী টুঁ শব্দটি করিনি। কিন্তু হয়তো আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ওরা শুনতে পেলো। ব্যস আর যায় কোথায়? আমাকে ওরা পাকড়াও করলো।

লোকটা চোর। আমাদের উপর টেক্কা দেবার ফিকিরে ছিলো। আমাদের আগেই এ বাড়িতে এসে মাল সরিয়েছে—দলের একজন মন্তব্য করলো।

আমি ওদের মনের ভুল ধারণা দূর করবার চেষ্টা করলুম। বলতে গেলুম আমি চোর নই। আমি হলুম বাড়ির মালিক, রাধা বোসের স্বামী, সাহিত্যিক সুপ্রকাশ কিন্তু আমি কোন কথা বলবার সুযোগ পেলুম না।

লোকদুটো এবার এক কাণ্ড করে বসলো। প্রথমে আমার মুখে এক লম্বা রুমাল গুজে দিলো। তারপর আমার বউর এক শাড়ি দিয়ে আমার সমস্ত শরীর বাধলো। তারপর একটা দড়ি দিয়ে আমার হাত পা বেধে আমাকে ঠিক দরজার সামনে রাখলো।

ব্যাটাকে যা বেধেছি। গলা দিয়ে টু-শব্দ করতে পারবে না। বাপস চোরের উপর বাটপাড়ী। রাধা বোস বাড়িতে এসে দেখুক আমরা চোরকে বেঁধে রেখে দিয়েছি।

একজন লোক বললো।

আর একজন হাসলো। তারপর বললো মজা হলো। আমরা এসেছিলুম চুরি করতে। এসে পেলুম না কোন মাল, পেলুম বড়ো চোর।

তারপর আমার কাছে মুখখানা টেনে নিয়ে বললো থাকো বাবা এখানে। এবার চুরি করার মজা দেখো।

এই বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ওরা দুজনে যে পথ দিয়ে এসেছিলো সেই পথ দিয়ে চলে গেলো।

আমি ঘরের ভেতর, দরজার পাশে, বন্দী অবস্থায় পড়ে রইলুম। হঠাৎ ঘড়ির শব্দ আমার কানে ভেসে এলো।

টিক টিক টিক…… …

আমি তাকিয়ে দেখলুম ঘড়িটা চলছে। আর ঠিক আমার পায়ের কাছে রয়েছে বোমা।

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখলুম পাঁচটা বাজে। একটু বাদে হয়তো আমার স্ত্রী বাড়িতে ফিরে আসবেন। সঙ্গে আসবে তাঁর লাভার অমিত গুপ্ত। বৈঠকখানায় বসে ওঁরা দুজনে হাসি ঠাট্টা করবেন। আর আমাকে এই পাশের ঘরে বসে এই হাসি ঠাট্টা শুনতে হবে। অসহ্য! কিন্তু কতোক্ষণ ওরা প্রেমালাপ করবে।

যেই ঘড়িতে ছ'টা বাজবে, বোমা ফাটবে—আর সমস্ত দরজা জানালা ভেঙে চুরমার হবে। আর ঐ সোফাসেটটিতে আমার স্ত্রী এবং অমিত গুপ্তের মৃত্যু হবে।

এর পরবর্তী ঘটনাগুলো চিন্তা করতেই আমার সমস্ত শরীর হিম

হয়ে গেলো।

মৃত্যু।

কার মৃত্যু হবে ?

রাধা বোসের মৃত্যু হবে, অমিত গুপ্ত মারা যাবেন—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও মারা যাবো।

সর্বোনাশ! একী করলুম আমি ? স্ত্রীকে হত্যা করতে গিয়ে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনলুম।

আমি স্ত্রীকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছিলুম কিন্তু নিজের বোকামির জন্যে আমার সমস্ত পরিকল্পনা, নকশা ভেস্তে গেলো। আজ নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা দিয়েছি।

গলা দিয়ে একবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু আজ আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুলো না।

ভগবানকে ডাকবার চেষ্টা করলুম। অতো কাতর কণ্ঠে কোনদিন ভগবানকে ডাকিনি।

বললুম ভগবান···গড···আল্লা তুমি আমার প্রার্থনা শোন। আমাকে বাঁচাও। আমাকে তুমি অমন কঠোর শাস্তি দিও না। আমার অপরাধকে তুমি মার্জনা করো। ভগবান, আল্লা, ঘড়িটাকে তুমি বন্ধ করে দাও। ঘড়ির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিনে। ও যে সামান্য ঘড়ির শব্দ নয়। ও যে মৃত্যুর ডাক।

কিন্তু আজ ভগবান আমার প্রার্থনা শুনতে পেলেন না।

ঘড়ির কাঁটা দ্রুত বেগে এগিয়ে চললো।

টিক—টিক—টিক···

পাঁচটা বাজে···

* * *

আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললুম। যখন আমার চেতনা ফিরে এলো তখন পাঁচটা বেজে গেছে।

খট্ করে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলুম। বুঝতে পারলুম আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরে এসেছেন। তাঁর গলার স্বর শুনতে পেলুম। সেই সঙ্গে সঙ্গে অমিত গুপ্তের গলার আওয়াজও পেলুম। আজ অমিত গুপ্ত আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফিরে এসেছেন।

আমার স্ত্রী মৃদুস্বরে কী জানি বললেন। জবাব দিলেন অমিত গুপ্ত। বুঝতে পারলুম অমিত গুপ্ত সোফাসেটটিতে বসেছেন। এক্ষুনি ওদের প্রেমালাপ শুরু হবে। অসম্ভব, কল্পনার বাইরে। ক্ষণিকের জন্যে আমি ভুলেগেলুম যে আজ আমার জীবন বিপন্ন হয়েছে, আমি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি বরং আমার কাছে আজ মনের হিংসেই প্রবল হলো···অসম্ভব। ওরা দুজনে পাশের ঘরে বসে ঐ প্রেমালাপ করবে, আর আমি সেই কথা শুনবো। আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা তীব্র হলো। নিজের মনকে ধিক্কার দিতে লাগলুম। ভাবতে লাগলুম কেন এই আমার হত্যার পরিকল্পনা করেছিলুম। হয়তো নিজের মনের হিংসাকে দমন করতে পারিনি। ভাবলুম নিজের স্ত্রীকে খুন করা উচিত নয়। না, না আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ কখনও গিন্নীদের উপর রাগ করে তাঁদের হত্যা করবার পরিকল্পনা করবেন না।

কিন্তু হঠাৎ আমি আবার আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হলুম। আমি যে বিপদে পড়েছি এর হাত থেকে রেহাই পাই কী করে?

একবার ভাবলুম স্টোররুমে কোন জিনিস রাখতে আমার স্ত্রী এই ঘরে ঢুকবেন। হয়তো দেখতে পাবেন যে আমার ভাড়া করা গুণ্ডাগুলো আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেছে। হয়তো আমার স্ত্রী এসে আমাকে মুক্ত করবেন। আমি তাঁর কাছে মাপ চাইবো। বলবো, রাধা আমি তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলুম। আমাকে তুমি মাপ করো। আমার মনে ঈর্ষা জেগেছিলো।

কিন্তু···

কিন্তু কী?

আমি তো দোষ করেছিলুম।

হঠাৎ আমার স্ত্রী এবং অমিত গুপ্তের আলাপ-আলোচনার টুকরো-টুকরো কথা আমার কানে ভেসে এলো।

অমিত দা—আমার স্ত্রী বললেন। অমিত দা! এই কণ্ঠস্বর আমার কাছে প্রেমের সুর বলে মনে হলো। কিন্তু তারপরেই ভাবতে লাগলুম রাধা অমিত গুপ্তকে দাদা বলে ডাকছে কেন? কী

ব্যাপার। প্রেমিকা কি কখনও প্রেমিককে 'দাদা' বলে ডাকে। কিন্তু তারপরেই মনে হলো যে আজকাল প্রেম করবার ওটাই হলো রীতি, নিয়ম। প্রথমে প্রেমিককে দাদা বলে ডাকে, তারপরে প্রেম শুরু হয়।

তোমাকে একটা সুখবর দেবো রাধা···অমিত গুপ্তের জবাব শুনতে পেলুম।

সুখবর! কী সুখবর দেবেন অমিত গুপ্ত।

আমি জানি এবার অমিত গুপ্ত কী বলবেন। হয়তো বলবেন রাধা আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর এই সুখবরটি রাধার স্বামীকে তার পাশের ঘরে বসে শুনতে হবে।

কী সুখবর অমিতদা···আবার আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

আজ কেন জানি আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর আরো মিষ্টি শোনালো। আমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না যে এ হলো ভালোবাসার সুর। আপনারা সিনেমার পর্দায় আমার স্ত্রীর অভিনয় দেখেছেন···কিন্তু আজ আমি পাশের ঘরে বসে তাঁর অভিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

আজ সুব্রত বাবুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি···অমিত গুপ্তের জবাব আমার কানে ভেসে এলো।

বাবা!

রাধার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত শোনাল। তার কথা বলার ঢং শুনে মনে হলো সে অমিত গুপ্তের কথা বিশ্বাস করতে পারেনি।

অমিত গুপ্তের কথা শুনে আমিও বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। রাধার বাবার নাম যে সুব্রত বাবু একথা আমার জানা ছিলো না। আমি ভেবেছিলুম যে রাধার বাবা জীবিত নেই। কোনদিন তো আমি রাধার সঙ্গে তাঁর বাবা কিংবা তাঁর পরিবার নিয়ে কোন আলোচনা করিনি। রাধার অতীত আমার কাছে কুহেলিকায় ঢাকা ছিলো। এই নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করিনি।

হ্যাঁ রাধা, তোমার বাবা বেঁচে আছেন। তাঁর পুলিশের বিপদ কেটে গেছে। এতোদিন পুলিশকে এড়াবার জন্যে গা ঢাকা দিয়ে-

ছিলেন। কিন্তু যে লোকটা আসলে ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙ্গেছিলো সে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে। অতএব তোমার বাবা আবার সমাজে ফিরে আসতে পারবেন।

বাবা বেঁচে আছেন। আমি যে তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিনে অমিতদা।

আমার মনে হলো আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। রাধার কণ্ঠে উত্তেজনা এবং ব্যাকুলতার সুর মেশান ছিলো।

হ্যাঁ রাধা আমি আশা করছি তোমার বাবা শিগ্গিরই কলকাতায় ফিরে আসবেন।

অমিত গুপ্তের কথা শুনে আমার মনে অনেক সন্দেহ জাগলো। রাধার বাবা পুলিশকে এড়াবার চেষ্টা করেছিলেন কেন?

ব্যাঙ্কের ক্যাশের সঙ্গে তাঁর কিসের সম্পর্ক? নিশ্চয় তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হয়েছিলো যে তিনি ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙ্গেছিলেন। কিন্তু এতোদিন তিনি সমাজে মুখ দেখাননি কেন?

এই প্রশ্নের জবাব অমিত গুপ্তই দিলেন। সুব্রতবাবু ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেননি। কারণ তিনি জানেন যে আজ তুমি পশ্চিমবাংলার একজন জনপ্রিয়া অভিনেত্রী। কিন্তু বাঙালী দর্শক সমাজ যদি জানতো যে তোমার বাবা হলেন আসামী তাহলে তোমার খ্যাতিতে ভাঁটা পড়তো। আর শুধু তাই নয়। আজ তুমি বিবাহিতা। তোমার স্বামী খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তোমার বাবার অস্তিত্বের খবর তোমার স্বামী জানেন না। কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার স্বামী জানতে পারেন যে তোমার বাবার নামের সঙ্গে কলঙ্ক লেগে আছে তাহলে তোমার সুখের জীবনে মেঘ দেখা দিতো। কিন্তু আজ তিনি কলঙ্ক মুক্ত হয়েছেন। তাই দশের কাছে এসে দাঁড়াতে তাঁর কোন দ্বিধা কিংবা সংকোচ নেই।

অমিত গুপ্তের কথা শুনে আমার মনের কৌতূহল ভাঙলো। তুমি ঠিক কথা বলেছো অমিত গুপ্ত।

সুপ্রকাশ পশ্চিমবাংলার একজন উদীয়মান সাহিত্যিক। হঠাৎ যদি কোনদিন তাঁর কানে ভেসে আসতো যে তাঁর স্ত্রীর বাবা জোচ্চোর তাহলে তিনি একদিনও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতেন না। বাজারের

মান-সম্মানকে আমি তুচ্ছ অবহেলা করতে পারিনে।

কিন্তু অমিত গুপ্ত তুমি কে?

কী তোমার পরিচয়?

তুমি রাধার অতীত জীবন তাঁর পারিবারিক কাহিনী জানলে কী করে?

অনেকক্ষণ আমার স্ত্রীর কোন জবাব শুনতে পেলুম না।

আমি মনে মনে কল্পনা করলুম যে, আমার স্ত্রী ঘরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইছে। আনন্দে না উত্তেজনায় বলতে পারবো না।

এবার আমার মানসিক অবস্থা অনুমান করুন।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। টিক···টিক···টিক···

এক এক সেকেন্ড ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যায় আর আমার জীবনের আয়ু কমে আসে।

আমি চীৎকার করে বলবার চেষ্টা করলুম, ওগো তোমরা কেউকী ঘড়ির কাঁটা বন্ধ করতে পারো না।

আবার আমি অমিত গুপ্তের গলা শুনতে পেলুম।

নিরুদ্দেশ হবার আগে তোমার বাবা বলেছিলেন যে, তিনি নিরপরাধ। বলেছিলেন আমি যেন তোমার ভাইকে দেখাশোনা করি।

ভাই!

তাহলে কী রাধার ভাই জীবিত আছে।

কোথায় সেই ভাই?

আমার মনে এই ধরনের একটি প্রশ্ন জাগলো।

অমিত গুপ্ত বলে চলেছেন: অনেকদিন তোমার কোন খোঁজ খবর নিতে পারিনি। বোম্বাইর স্টুডিওতে আমি দুটো ছবির কাজে ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু তারপর দেখলুম তুমি রাতারাতি বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী হয়েছ। তোমার যে অভিনয় প্রতিভা আছে এর আগে জানতুম না।

অমিত গুপ্ত থামলেন।

আমার স্ত্রী কোন জবাব দিলেন না।

একটু বাদে অমিত গুপ্ত আবার কথা বলতে শুরু করলেন। আমি কান খাড়া করে সেই আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলুম।

জানো রাধা তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ, পরিচয় হয়েছে বটে কিন্তু তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হলো তিনি আমাকে দেখে একটুও খুশি হননি। হয়তো উনি ভাবছেন আমি তোমার প্রেমিক। কিন্তু উনি কি জানেন যে আমি হলুম তোমার ভাই সুজয়ের বাল্যবন্ধু আর তুমি হলে আমার বোন।

অসম্ভব! ইম্‌পসিবল।

বোন!

তুমি রাধার ভাই, সুজয়ের বন্ধু হতে পারো বটে কিন্তু রাধা তোমার বোন নয় একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। আজ কলকাতার বাজারের সবাই জানে তুমি হলে রাধার প্রেমাস্পদ। তোমাদের দুজনের হৃদ্যতা সম্পর্ক নিয়ে বাজারে যে মুখরোচক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে সে কথা কী আমি জানিনে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

ও তো ঘড়ির কাঁটা নয়।

ও হলো আমার হৃৎপিন্ডের শব্দ!

আমার মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসছে।

কিন্তু মরবার আগে আমি কী একবারও রাধার কাছে মাপ চাইবার সুযোগ পাবো না।

বলতে পারবো না, রাধা আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। সদা সর্ব্বদাই আমি ভাবতুম অমিত গুপ্ত তোমার প্রেমিক। শুধু তাই নয়।

প্রতিদিন যখন তোমার স্তাবকের দল এবং প্রেমিকেরা তোমার চারপাশে ঘুরতো তখন হিংসেয় আমার মন জ্বলে উঠতো। শুধু কী তাই? আমি তোমাকে খুন করে ইন্সিওরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করেছিলুম। আমি রাজেনকে ব্ল্যাক্‌মেল করে আজ আমার বাড়িতে ডাকাতির বন্দোবস্ত করেছিলুম।

কিন্তু ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। আজ আমি নিজের তৈরি ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছি।

ওদিকে ঘড়ির কাঁটার শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

টিক-টিক-টিক...... ..

রাধা তুমি শিগ্গিরই এই ঘরে এসো। ঘড়ির শব্দ আমাকে বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঘড়িটা বন্ধ করে দাও। আমার হাত পায়ের দড়িগুলো খুলে দাও।

পাশের ঘর থেকে আবার আমার স্ত্রীর গলার শব্দ শুনতে পেলুম।

উনি বললেন আজ কিছুদিন হলো আমার স্বামীর আচার ব্যবহারে আমি নিজেই বিস্মিত হয়েছি। দেখতে পাচ্ছি উনি তোমাকে সন্দেহ করছেন। হয়তো আমার স্বামীর এই ব্যবহারের জন্যে আমিই দায়ী। কোনদিন তো তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলিনি। বাবার কথা, ভাইয়ের কথা সবই তাঁর কাছ থেকে গোপন করে গিয়েছিলুম।

রাধার কথা শুনে আমি মনে মনে বললুম হ্যাঁ রাধা আমি তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম। কিন্তু বিশ্বাস করো আজ আমার মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। আমি তোমাকে আর অবিশ্বাস করিনে। এবার রাধা তুমি এই ঘরে এসে আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। তুমি আমাকে মুক্ত না করলে আমি যে মারা পড়বো।

এবার অমিত গুপ্ত কী জানি একটা জবাব দিলেন। তাঁর কথা আমি শুনতে পেলুম না।

আমার স্ত্রীর কথা শুনতে পেলুম।

অমিতদা, নিজের জীবনের কথা স্বামীর কাছে খুলে বলতে ভয় পেয়েছিলুম। আমার বাবা যে ফেরারী আসামী এবং তাঁর নামের পেছনে যে পুলিশের হুলিয়া আছে সেই কথা বলতে ভয় পেয়েছিলুম। আমার ভাই সুজয় ছিলো কমিউনিস্ট। একথাও তাঁকে বলতে সাহস পাইনি। সবেমাত্র সিনেমায় অভিনয় করে নাম কিনেছি। এই সময়ে বাজারে অপবাদ কিনতে চাইনি। বেঁচে থাকার জন্যে, পয়সা রোজগারের জন্যে সিনেমায় নামা আমার একান্ত আবশ্যক ছিলো। ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কের পলাতক কেশিয়ারের কন্যা

রাধা বোস এই পরিচয় দিয়ে সিনেমা জগতে কোন স্থান পেতুম না। কারণ আজো আমাদের সমাজে প্রতিভার চাইতে সামাজিক পদ-মর্যাদার মূল্য অনেক বেশি। আর একটা কথা মনে রেখো অমিতদা। এই বিচিত্র সিনেমা জগতে সুন্দর মুখ থাকলে বন্ধুর চাইতে শত্রুর সংখ্যাই বেশি হয়। কারণ যারা আমার দেহকাঙ্খা ক'রে নিরাশ হয়ে ফিরে যান তাঁরাই আমার কুৎসা রটিয়ে বেড়ান। তাই অতীত পারিবারিক জীবনীকে ব্যক্ত করে বাজারে দুর্নাম কিনতে চাইনি।

তুমি আমার জীবনের সব কথাই জানো অমিতদা। তুমি জানো প্রসেশন করতে গিয়ে সুজয় পুলিশের গুলিতে মারা পড়লো। সংসারে আমার আপনজন বলতে আর কেউ রইলো না। মা তো আগেই মারা গিয়েছিলেন। তোমার খোঁজ নিলুম। শুনলুম তুমি বোম্বাইতে চলে গেছো। সেদিন আমার বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল ছিলো আমার সুন্দর মুখ।

সেদিন জানতুম না কী করে আমার অন্ন জুটবে। একদিন একটা লোক এসে আমাকে বললো ফিল্মে এক্‌স্ট্রার কাজ করবে। কুড়ি টাকা মাইনে পাবে। ইঙ্গিতে আরো বললো যদি অন্য কোন কাজ করি তাহলে আরো বেশি টাকা মিলবে। আর এই অন্য কাজটি কী বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হলো না। কিন্তু আমি অন্য কাজ করতে রাজী হইনি। শুধু এক্‌স্ট্রার কাজ করতে রাজী হয়েছিলুম। কিছুদিন পরে আমার ভাগ্য পরিবর্তন হলো। ভগবান আমার প্রতি সদয় হলেন।

আমি—

রাধার কথা শেষ হবার আগেই আমি মনে মনে বললুম, তার পরবর্তী ঘটনা আমি জানি। আমি জানি যে, তুমি কালীতারা ফিল্মস স্টুডিওতে অনেক একস্ট্রার মেয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলে। মিস্ বাগচীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে আমি উত্তেজিত হয়েছিলুম। হঠাৎ আমি রাগের মাথায় মিস্ বাগচীকে বললুম, যেকেউ ঐ রোলে আপনার চাইতে ভালো অভিনয় করবে।

এই কথা বলে আমি তোমার মুখের দিকে তাকালুম রাধা।

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হলো।

সেদিন তুমি আমার কাছে অপরিচিত ছিলে কিন্তু তোমার চোখ দেখে মনে হলো তুমি আমার কাছে বহু পরিচিত। তোমার কালো হরিণ চোখ আমাকে ইসারায় বললো তোমার কথা সার্থক হবে। আমি তোমার ইজ্জত রাখবো। তারপর ঝোঁকের মাথায় আমি এক্‌স্ট্রাদের মাঝ থেকে তোমাকে ফ্লোরে টেনে আনলুম। আমি তোমাকে হিরোইনের পাটটা বলতে বললুম। তুমি চমৎকার অভিনয় করলে। আমি ডিরেক্টর সৌমেন চাটুজ্যের কাছে দম্ভ করে বললুম এই মেয়েটি মিস্ বাগচীর চাইতে ভালো পার্ট করতে পারবে।

আমার কথা শুনে মিস্ বাগচী ফ্লোরে থেকে ঝটকা মেরে বেরিয়ে গেলেন। এতো অপমানিত এর আগে তিনি কখনও হ'ননি। কিন্তু রাধা আমার সেদিনকার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি। তুমি আমার ইজ্জত রেখেছিলে।

তাহলে রাধা আমি তোমার উপর রাগ করেছিলুম কেন? কী কারণে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলুম। ও কী কীসের আওয়াজ হচ্ছে। ইঁদুরের শব্দ···না না ঘড়ির আওয়াজ···

টিক···টিক···টিক···

সাড়ে পাঁচটা বাজে। আর আধঘণ্টা বাদে আমার মৃত্যু হবে। আপনারা সাহিত্যিক সুপ্রকাশের মৃত্যু দেখতে পাবেন। কাগজে কাগজে ফলাও করে আমার মৃত্যু সংবাদ বেরুবে। আমার জীবনী প্রকাশিত হবে। আপনারা সবাই বলবেন ডাকাতের দল সুপ্রকাশকে মেরেছে। কিন্তু আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই যে দায়ী একথা কেউ জানতে পারবে না। শুনেছি মৃত্যু নাকি বীভৎস কুৎসিত শীতল। আজ আমি সেই কদাকার মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছি।

অমিতদা···আমি আবার আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। উনি তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করবার চেষ্টা করছেন।

হ্যাঁ, অমিতদা ভগবান সেদিন আমার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিলেন। আমার স্বামী হঠাৎ আমাকে একস্‌ট্রার দল থেকে টেনে ক্যামেরার কাছে নিয়ে স্ক্রীনটেস্ট দিলেন। বললেন পার্ট করো। আমাকে পার্ট উনিই বুঝিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন।

কী নাম তোমার ?

আমি সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিলুম, রাধা। বেশ রাধা এবার শোনো তোমাকে কী অভিনয় করতে হবে। মনে করো কলকাতার এক বড়ো রাস্তা। সবেমাত্র ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের মারপিট হয়ে গেছে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ধর্ম্মঘটী আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। ধর্ম্মঘটীরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। অনেক দূরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। অপর প্রান্তে ধর্ম্মঘটীরা দাঁড়িয়ে আছে।

টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় সমস্ত রাস্তা আচ্ছন্ন!

আমার স্বামী আমাকে বোঝাতে লাগলেন।

রাধা তুমি হলে এই বইর নায়িকা। তোমার পেশা হলো গণিকাবৃত্তি। তোমার অবস্থার হেরফের সাংসারিক চাপে পড়ে তোমাকে এই পেশা অবলম্বন করতে হয়েছিলো।

আহত ধর্মঘটীদের ভেতর একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে ছিলো। ছেলেটি তোমাকে দিদি বলে ডাকে। ছেলেটির বাঁচবার আশা কম। তার বুকে একটা গুলি লেগেছে। সেইখান দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তুমি এবার ছেলেটির কাছে ছুটে যাবার চেষ্টা করবে। ধর্ম্মঘটীরা তোমাকে যেতে বাধা দেবে। ওরা চীৎকার করে বলবে, যাবেন না, যাবেন না, পুলিশ গুলি চালাবে। কিন্তু তুমি ওদের কথায় কান দেবে না।

আহত ছেলেটির মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। এবার সে অনেক কষ্ট করে বলবে, দিদি আমি বড্ডো কষ্ট পাচ্ছি। বুক থেকে খানিকটা রক্ত চুষে বের করে দাও।

রাধা তুমি ছেলেটির ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুষে বার করবে। জনতার দু'একজন এবার তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে।

তোমাকে বলবে, চলে আসুন, আর দেরি করবেন না। পুলিশ আবার গুলি চালাবে।

রাধা তুমি রক্তাক্ত মুখ নিয়ে ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

তোমার সমস্ত চেতনা শক্তি তুমি হারিয়েছ।

জনতার ভেতর থেকে একজন তোমাকে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে

নেবার চেষ্টা করবে। তুমি ঝটকা মেরে বলবে, জাহান্নামে যাক তোমাদের রাজনীতি, জাহান্নামে যাক তোমাদের দেশ সেবা। একটা শিশুর প্রাণ নিয়ে আজ যারা ছিনিমিনি খেলতে সংকোচ বোধ করলো না আমি তাদের ঘৃণা করি···

এই কথা বলতে বলতে আমার স্ত্রী'র কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেলো।

গলাটা ধরে গিয়েছিলো।

একটু বাদে আবার আমার স্ত্রী বলতে লাগলেন।

আমি সেই পার্ট করলুম। আমার মনে পড়ে প্রথম যেদিন পশ্চিমবাংলার দর্শকেরা আমার অভিনয় দেখলো সেদিন তারা আমার অভিনয় দেখে চমকে গেলো। বললো, আমি অপূর্ব, অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছি। সমালোচকেরা বললেন, আমি চরিত্রে প্রাণ দিয়েছি। মিস্ বাগচী অমন অভিনয় করতে পারতেন না। কিন্তু অমিতদা আমি তো সেদিন অভিনয় করিনি। আমি যে বাস্তব জীবনের কথাগুলো ব্যক্ত করেছিলুম। ছবির ঐ দৃশ্যে যে আমারই জীবনের এক কাহিনী। কাহিনীর সঙ্গে আমার জীবনের এতো সাদৃশ্য থাকতে পারে তার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। শুধু পর্দার মেয়েটির সঙ্গে আমার জীবনের এই পার্থক্য ছিলো যে আমি ছিলুম এক্স্ট্রা গার্ল আর রুপালী পর্দ্দার মেয়েটি ছিলো সামান্য গণিকা। কিন্তু বাকি আর সব ঘটনা ছিলো আমার জীবনের কাহিনী। তাই আমার অভিনয় দেখে সবাই আকৃষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু আমার অভিনয় কেন ভালো হয়েছিলো তার কারণ কেউ জানতো না। এর কারণ তোমাকে বলেছি।

তুমি জানো অমিতদা, সুজয় প্রতিদিন ধর্মঘট করতে বেরুতো। বলতো প্রসেশান মিছিলে যোগ দেওয়া হলো পার্টীর কাজ। পার্টীর কাজ ছাড়া ওর জীবনে আর কিছুই ছিলো না।

একটি দিনের কথা আমার মনে আছে। হয়তো গোটা জীবনেই মনে থাকবে। বিকেল বেলা সুজয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলুম কোথায় যাচ্ছো?

বললো কাজে বেরুচ্ছি। আর একটু বাদেই ফিরে আসবো।

কিন্তু সঞ্জয় আর বাড়ি ফিরে এলো না। পাড়ার লোকদের মুখে শুনতে পেলুম সঞ্জয় খুব বড়ো একটা প্রোসেশান নিয়ে বেরিয়েছিলো। কিন্তু মাঝপথে পুলিশ প্রোসেশান আটকে দেয়। ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের মারপিট হয়। পুলিশ গুলি চালায়। খবরটা শুনে আমি বিচলিত হলুম। দৌড়ে ছুটে ঘটনাস্থলে গেলুম। মনে মনে যা ভেবেছিলুম তাই হয়েছিলো। দলের পুরোভাগে ছিলো সঞ্জয়। তাই পুলিশের গুলি এসে সঞ্জয়ের গায়ে লাগে। সঞ্জয় আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। সমস্ত রাস্তা টিয়ারগ্যাসে আচ্ছন্ন। অনেক দূরে সঞ্জয়ের বন্ধুরা হিংস্র পশুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। সুযোগ পেলেই তারা পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি সঞ্জয়ের কাছে ছুটে যাবার চেষ্টা করলুম। ধর্মঘটীরা চীৎকার করে বললো ; দিদি তুমি যেওনা। পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু সেদিন আমি পুলিশের গুলিকে ভয় করিনি। দৌড়ে গিয়ে সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরলুম।

সঞ্জয় আমার কোলে শুয়ে মারা গেলো। শুধু মরবার আগে একটি কথা বলে গেলো। বললো ; দিদি জীবনে শুধু মিথ্যে কথা শিখে গেলুম। শিখে গেলুম দেশ সেবার নাম করে সবাই ভণ্ডামি করে, মিথ্যে কথা বলে, সমাজ সেবার নাম করে সবাই চুরি করে ওরা দরিদ্রের অর্থাভাবের সুযোগ নিয়ে জীবনের উন্নতি করে। ওরা হলো অর্থলোভী, বাদুড়, সমাজের রক্ত চুষে খায়। ইতিহাসে পড়েছি অন্য দেশের ঐশ্বর্য্যের কথা। কিন্তু আমার দুঃখ রইলো দিদি যে, আমি নিজের চোখে আমার দেশের ঐশ্বর্যকে দেখতে পেলাম না!

তারপর সঞ্জয় বুকটা দেখিয়ে বললোঃ বড্ডো ব্যথা দিদি। রক্তটা বের করে দাও। আমি মুখ দিয়ে রক্ত চুষে বের করে দিলুম। হ্যাঁ অমিতদা সেদিন আমি অভিনয় করিনি। সেদিনকার ঘটনা ছিলো আমার বাস্তব জীবনের কাহিনী।

সঞ্জয় মারা গেলো।

সংসারে আমি হলুম একা, অসহায়। কিছুদিন ধরে আমি জীবিকা অর্জনের সন্ধানে বেরুলুম। হলুম ফিল্ম অ্যাক্‌ট্রেস, কালীতারা ফিল্মসের এক্‌স্ট্রা গার্ল। হঠাৎ ঐ এক্‌স্ট্রা মেয়েদের

দলের ভেতর আমাকে টেনে নিয়ে এসে আমার স্বামী আমাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করালেন। বললেন ঃ অভিনয় করো। বইয়ের নায়িকার ভূমিকা তোমাকেই করতে হবে। বলো জাহান্নামে যাক্ তোমাদের রাজনীতি, জাহান্নামে যাক্ তোমাদের দেশসেবা।

একই পরিস্থিতি, একই দৃশ্য।

যা একদিন আমার জীবনে ঘটেছিলো আজ আমাকে সেই দৃশ্য অভিনয় করতে বলা হলো। অমিতদা, আমি তো সেদিন অভিনয় করিনি। শুধু সুজয়ের মৃতদেহ নিয়ে যে অব্যক্ত কথা বলতে পারিনি আজ সেই কথাগুলোকে ব্যক্ত করলুম। তাই সেদিন আমার অভিনয় এতো সজীব, মূর্ত্ত হয়ে উঠলো।

আমার স্ত্রী একটু থামলেন।

আমাকে ওরা জানালো যে তোমার ঠিকানার পরিবর্তন হয়েছে। তারপর তুমি বড়ো অভিনেত্রী হলে। বাজারে তোমার সুনাম হলো। আমি তোমাকে কালীতারা ফিল্মস স্টুডিওর ঠিকানায় দু'তিন খানা চিঠি লিখলুম। কিন্তু সব চিঠিই ফেরৎ এলো। কেন জানিনে।

এবার আমি চীৎকার করে বলবার চেষ্টা করলুম। বললুম, অমিতবাবু শুনুন। আপনি জানেন না কিন্তু আমি জানি ঐ সব চিঠি কেন ফেরৎ গিয়েছিলো। স্টুডিওর কর্মচারিরা আমার কাছে ঐ সব চিঠি দিয়েছিলো। কিন্তু আপনার হাতের লেখা দেখে আমার মনে সন্দেহ হয়েছিলো। ভেবেছিলুম আমার স্ত্রীর কোন প্রেমিক নিশ্চয় ঐ সব চিঠি লিখেছে, তাই সব চিঠি আপনাকে ফেরৎ পাঠিয়েছিলুম, হ্যাঁ অমিতবাবু, আজ আমি স্বীকার করছি। আই অ্যাম এ জেলাস হাজব্যান্ড।

আবার অমিত গুপ্তের জবাব শুনতে পেলুম।

উনি বলেছেন, রাধা আমি পশ্চিমবাংলায় এসে শুনতে পেলুম তুমি আজ চিত্রজগতে সেক্সকুইন হয়েছ। সেক্সকুইন শব্দটি শুনে আমার মনে হাসি পেয়েছিলো। সুজয়ের বোন রাধাকে আমি কখনই সেক্সকুইন হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে কোন সিরিয়াস রোলে তোমার সত্যিকারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রডিউসার বিনোদপাল এসে আমাকে যখন

বললেন যে উনি "মনের মুকুট" বইটি সিনেমা করতে চান এবং আমাকে উনি ছবি পরিচালনার ভার দিলেন তখন আমি তোমার কথা ভাবলুম। কারণ আমি জানতুম যে ঐ বইয়ের নায়িকার রোল তুমিই করতে পারবে।

এবার আমার স্ত্রী জবাব দিলেন।

বললেন, হ্যাঁ অমিতদা, তুমি যখন আমাকে "মনের মুকুট" বইতে অভিনয় করতে বললে তখন আমি তোমর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলুম। কিন্তু তখন কী ছাই আমি জানতুম যে আমার স্বামী ঐ বইতে আমার অভিনয় করতে আপত্তি করবেন। এই ঘটনার পর থেকে আমার স্বামীর আচার ব্যবহারে পরিবর্তন দেখতে পেলুম। আমার মনে হলো যে উনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু ওঁর কাছে মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ পেলুম কোথায়? হ্যাঁ আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি।

সুজাতার কথা শুনে আমার মাথায় এক ঝলক রক্ত উঠে গেলো।

রাধা তুমি বলছো কী? তুমি আমাকে ভালোবাসো। অসম্ভব, এতোদিন তুমি আমাকে একথা বলোনি কেন? আমি যে তোমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিনে। আমি যে তোমাকে ভুল সন্দেহ করে ইঁদুরের মতো করে বেঁধে খুন করতে চেয়েছিলুম। কারণ অতি সহজ ও সরল। কারণ হলো আমার মনের হিংসে, স্বামীর জেলাসি। জানো রাধা মেয়েদের মনে যখন হিংসে হয় তখন ওরা সেই হিংসে মনে পুষে রাখে, আর স্বামীদের মনে যখন হিংসে হয় তখন ওরা বউকে খুন করে। তার প্রমাণ হলো আমি।

আমি চীৎকার করে এই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মনের কথা মনেই রইলো। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না। শুধু ইঁদুর ডাকলে যেমনি আওয়াজ হয় তেমনি আমার গলা দিয়ে একটি আওয়াজ বেরুলো।

হয়তো আমার ক্ষীণ কণ্ঠ রাধার কানে পেঁাছল। কারণ আমি শুনতে পেলুম রাধা বললো, শুনতে পাচ্ছো! আমি যেন পাশের ঘরে কিসের আওয়াজ শুনতে পেলুম।

আমি মনে মনে বললুম, রাধা তুমি জানতে চাও ওটা কীসের

আওয়াজ। ওটা তোমার জেলাস হাজব্যাণ্ডের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। তোমার স্বামীকে ডাকাতেরা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেছে। আর জানো ওরা কেন আমাকে বেঁধে রেখে গেছে। কারণ আমি তোমাকে খুনের পরিকল্পনা করেছিলুম। কিন্তু আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেছে। আজ আমি নিজের হাতে নিজেকে খুন করবার প্ল্যান করেছি। একটু বাদে ঘড়িতে ছ'টা বাজবে আর সেই সঙ্গে বোমা ফাটবে। আর তারপরেই তুমি আমার মৃতদেহ দেখতে পাবে। রাধা ডালিং তুমি শিগ্‌গিরই এই ঘরে এসো। আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। শুনতে পাচ্ছো না ঘড়ির টিক টিক শব্দ। বড়ো জোরে ঘড়িটা চলছে।

রাধা এবার যেন দরজার কাছে এলো।

ওকী রাধা তুমি দরজটা খুলছো না কেন? দরজার হাতলটা একটু মোচড় দাও, দেখবে দরজটা খুলে গেছে। তুমি এর আগে কতোবার এই দরজার ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতর এসেছ। আজও একবার এসো, দেখে যাও তোমার স্বামী মৃত্যুর সঙ্গে কী করে লড়াই করছে।

রাধা দরজাটা খুললো।

রাধা, এসো, ঘরের ভেতর এসো। ঠিক দরজার পাশেই আমাকে ওরা বেঁধে রেখে গেছে। হ্যাঁ দরজার বামদিকেই সুইচ। আলোটা জ্বালো। কী বলছো রাধা? তুমি ঘড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছো না।

টিক-টিক-টিক······

না, না ওটা ঘড়ির শব্দ নয়।

ওটা হলো দানবের রুদ্ধশ্বাস!

একটু বাদে ঐ ঘড়িটা আমার গলা টিপে মারবে।

তুমি কোথায় যাচ্ছো রাধা?

যেও না। শোন।

এসো আমার হাতের বাঁধন খুলে নাও। আমাকে মুক্ত করো। আমি চিরজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। বিশ্বাস করো। তুমি আমাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিও না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাধা বললো ঘরটা ভারী অন্ধকার কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। আর ঘরের ভেতর যা ইঁদুর রয়েছে।

না, না কোন ইঁদুর নেই। তুমি যেটাকে ইঁদুর বলে ভাবছো আসলে ওটা ইঁদুরের ডাক নয় আমার গলার শব্দ। তুমি যেও না রাধা। ঘরের ভেতরে এসো—আমি আর একবার কথা বলবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কোন শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না। বরং কণ্ঠস্বর দিয়ে একটা অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেলো আর সেই ধ্বনি ঠিক ইঁদুরের ডাকের মতো শোনাল।

ও বাবা, আমার ঘরের ভেতর ঢুকতে ভয় করছে। আজ আমার স্বামী বাড়িতে ফিরে এলে ঘরের জঞ্জালগুলো পরিষ্কার করতে হবে।

না না রাধা আজ তুমি আমাকে সাহায্য না করলে তোমার স্বামী আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।

এবার আমি অমিত গুপ্তের গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম।

ঐ ঘরে ঢুকোনা। ইঁদুরে কামড়ে দেবে। কাল ঘর পরিষ্কার করে নিও।

রাধা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একবারও বাতিটা জেলে দেখলো না যে তার হতভাগা স্বামী ঘরের ভেতরে পড়ে আছে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

আমার বাঁচবার আশা দূর হয়ে গেলো। মৃত্যুর কালো পর্দা আবার আমার চোখের সামনে নেমে এলো।

আমি চীৎকার করে বলবার চেষ্টা করলুম।

রাধা অমিতবাবু, হেল্প মী। আমাকে সাহায্য করুন। মরতে দেবেন না, বাঁচান।

কিন্তু আজ রাধা কিংবা অমিত গুপ্ত আমার কথাগুলো শুনতে পেলো না। জানতে পারলোনা যে পাশের ঘরে একটি লোক মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

আবার অমিত গুপ্তর গলার স্বর শুনতে পেলুম।

উনি বললেন সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখনও তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে এলেন না। আজ কয়দিন ধরে মনের মুকুট বই নিয়ে তোমার

স্বামীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে উনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

কী ব্যাপার বলোতো?

রাধা একটা জবাব দিলো। গলার স্বর ভারী।

কী আর করবেন। হয়তো অলিম্পিয়া বারে বসে আছেন। আজকাল বেশির ভাগ সময় ঐ বারেই কাটান। চলো অমিতদা একবার অলিম্পিয়া বারে। ওখানে খোঁজ করলে নিশ্চয় ওর দেখা পাবো।

আমার মনে হলো ওরা দুজনে বেরুবার জন্যে বাইরের দরজা খুললো।

রাধা শোন তোমার স্বামী অলিম্পিয়া বারে বসে নেই। এইখানে বন্দী হয়ে আছেন—

কিন্তু আমার কথা ওরা শুনলো কি?

অমিত গুপ্ত বললেন দি আইডিয়া···

একটু বাদে ওদের দুজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলুম ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমার খোঁজে অলিম্পিয়া বারে যাচ্ছে।

দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁচবার সমস্ত আশা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

আমি ভাবতে লাগলুম এবার কী করবো? ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

সময় বয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে।

ঘরের জানালা খোলা ছিলো।

আজ আমার হঠাৎ পুরানো দিনের কিছু কথা মনে পড়লো। 'মনে হলো লোকের কাছে আমি কতো দম্ভ করে বেড়িয়েছি। সবাইকে বলেছি সুপ্রকাশ কবি, বুদ্ধিজীবী। আমি নিজে কখনও কল্পনা করিনি যে আমার পরে মানব জগতের আর একটা স্তর আছে। কিন্তু তবু মনে হলো যে নিজের নির্বুদ্ধিতা অহমিকার জন্যে আজ আমি মৃত্যুর ফাঁদে পা দিয়েছি।

আমি মনে মনে বললুম রাধা তুমি আমার ভুল মনে গর্ব ভেঙ্গে দিয়েছ। আমি তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলুম। ভেবেছিলুম তুমি আমার অজ্ঞাতসারে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করছ। কিন্তু আমি যে কী স্তরের জীব, কী ধাতের মানুষ তার আভাষ তোমাকে দিইনি। আমার চরিত্রকে তোমার কাছে প্রকাশ করিনি।

রাধা আজ তোমার কাছে একটি সত্যি কথা বলবো। আমি চরিত্রবান পুরুষ নই। কোন পুরুষই নয়। আমরা বউয়ের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলি, মনের গোপন কথা তাদের কাছে প্রকাশ করিনে··· কিন্তু আড়ালে আবডালে আমরা সবাই লুকিয়ে প্রেম করি। আমিও লুকিয়ে প্রেম করতুম। তুমি কী কখনও বাজারের মুখরোচক গুজব শুনেছ···আমার শত্রুরা বলতো সুপ্রকাশ সাহিত্যিক কিংবা বুদ্ধিজীবী নয় সুপ্রকাশ হলো···কাসানোভা, দি গ্রেট লাভার।

আসল কথা কী জানো ? যেদিন থেকে আমি হলুম চিত্রাভিনেত্রী রাধা বোসের স্বামী সেদিন থেকে আমার চালচলন, আদব কায়দা সব পাল্টে গেলো। আমার হাতে সদা সর্বদা থাকতো বিলেতি দামী সিগারেটের প্যাকেট। ট্যাক্সী ছাড়া আমি চলতুম না আর বারে আমার পানীয় ছিলো বিলেতি স্কচ। মেয়ে মহলে আমি জনপ্রিয় হলুম। বিস্তর বান্ধবী জুটলো। ওদের ধারণা ছিলো যে সুপ্রকাশ হলো সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী। মেয়েদের সঙ্গে আমি এমন ভাব করতুম যেন ওদের প্রতি আমার মনের কোন দুর্বলতা নেই। ককটেল পার্টীতে আমি হুইস্কীর গ্লাস হাতে করে ঘরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতুম আমার চোখ মুখে থাকতো একটা অবজ্ঞার ভাব। সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা এসে আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করবার চেষ্টা করতো কিন্তু আমি সবার সঙ্গে গল্প করতুম না। যে মেয়েটিকে আমার ভালো লাগতো তার সঙ্গে আড়ালে কথাবার্তা বলতুম কিংবা তাকে ডিনারে চায়ে নেমন্তন্ন করতুম। মেয়েটির মন ভোলাবার জন্যে তাকে বলতুম, সত্যি। আপনি সুন্দরী। আপনাকে দেখলে আমার গ্রীসের মেয়ে হেলেনের কথা মনে হয়। মেয়েটি বিস্মিত হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকতো। হেলেন। নামটি তার কাছে অপরিচিত। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করতো হেলেন নিশ্চয় আপনার কোন

গল্পের নায়িকা।

আমি যে বুদ্ধিজীবী এ কথা জাহির করাবার সুযোগ পেতুম। হেসে জবাব দিতুম ঃ হেলেন! সী ইজ দি হিরোহিন অব গ্রীক ড্রামা? আর একথা বলতে বলতে আমি মেয়েটির কোমল হাত দুটি আমার হাতের ভেতর টেনে আনতুম। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হতো। কিন্তু তার লজ্জা ছিলো ক্ষণিকের, একটু পরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠতো।

সে হাসি দেখে মনে হতো যেন সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

এমনি করে আমি বিস্তর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়িয়েছি, এ সব প্রেম কাহিনী তোমাকে কখনও জানতে দিইনি সুজাতা, কিন্তু কিছুদিন পরে আমার নিন্দুকেরা মানে হিংসুটের দল বাজারে অপবাদ রটাতে শুরু করলো সুপ্রকাশ ইজ এ কাসানোভসা। আমি লোকের অপবাদে কখনও কান দিইনি শুধু মনে মনে বলতুম জেলাস?

আজ মরবার আগে তোমার কাছে কয়েকটি কথা স্বীকার করে যাবো সু। আমি সাহিত্যিক। তাই অনেক মেয়ে এসে আমার কাছে তাদের লেখা গল্প কবিতা দেখাতো। এদের মধ্যে একটি মেয়ের কথা আমার বেশ মনে থাকবে। মেয়েটি বিবাহিতা। এক-দিন এক ককটেল পার্টিতে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলো। প্রথমে আমার কথাবার্তায়, চালচলনে ছিলো অবজ্ঞার রেশ। কিন্তু আমি তাকিয়ে দেখলুম যে মেয়েটির মুখ ভারী সুন্দর, মিষ্টি। আমার মন ভিজে গেলো।

আপনার নাম সুপ্রকাশ বাবু?

আপনার অনুমান মিথ্যে নয়—

আমি বেশ তাচ্ছিল্য সুরে জবাব দিই।

আপনার লেখা কবিতা আমার ভারী ভালো লাগে—মেয়েটি বললো।

আমি বুঝতে পারলুম যে মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে। কারণ আমি গল্প উপন্যাস লিখি কবিতা লিখিনে। মেয়েটির স্বপ্ন আমি

ভাঙতে চাইলুম না। জিজ্ঞেস করলুম আমার কোন কবিতা আপনার ভালো লেগেছে।

মেয়েটি আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে থতমত খেলো, আমার প্রশ্নের সুরে যে ব্যঙ্গের আভাস ছিলো বুঝতে পারলো। সে এবার কথা এড়িয়ে গেলো। শুধু বললো আমিও কবিতা লিখি।

তাই নাকি? আমার কণ্ঠে বিস্ময় কপটতার সুর।

অবশ্যি প্রকাশ্যে লিখিনি। লুকিয়ে লিখি। কারণ আমার স্বামী বিশ্বাস করেন না যে আমার লিখিবার ক্ষমতা আছে।

তারপর একটু থেমে মেয়েটি বললো আপনি শুনবেন আমার দু-চারটে কবিতা?

মেয়েটি কী ধরনের কী শ্রেণীর লিখিকা বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হলো না? তবু ওর মন তুষ্ট করবার জন্যে বললুম নিশ্চয়, কবে শোনবেন আপনার কবিতা।

দিন স্থান ঠিক হলো। একটি নির্জন নিরালা রেস্তোরাঁয় আমি মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। মেয়েটি সযত্নে তার কবিতার খাতা বের করলো। দু-তিনটে কবিতা পড়ে শোনালো। কাঁচা হাতের লেখা। ছন্দ কিংবা মিল নেই তবু আমি ওর কবিতার প্রশংসা করলুম। মিথ্যে কথা বললুম। খুব ভালো হয়েছে।

সত্যি বলছেন—মেয়েটি যেন আমার কথা একেবারে বিশ্বাস করতে পারে না।

আমার মতামতের মূল্য আছে। আমি ভারিক্কী কণ্ঠস্বরে জবাব দিলুম। হঠাৎ আমার মাথায় কী দুর্বুদ্ধি জাগলো বলতে পারব না। আমি বলে বসলুম আপনার কবিতাগুলো এতো ভালো হয়েছে যে এগুলো প্রকাশ করা দরকার।

মেয়েটি যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলো না। বিস্মিত হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো অর্থাৎ আপনি বলছেন যে এগুলো ছাপা হয়ে বইয়ের আকারে বেরুবে আর সেই বইতে লেখিকা বলে আমার নাম থাকবে।

নিশ্চয় আপনার নাম থাকবে না তো কার নাম থাকবে—আমি একটু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলুম।

সত্যি আপনি যদি আমার কবিতাগুলো ছেপে প্রকাশ করে দেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আমার স্বামী বিশ্বাস করেন না যে আমি লিখতে পারি। একদিন আমার লেখা একটি কবিতা ওকে পড়ে শোনাবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু আমার স্বামী কী করলেন জানেন? কবিতার খাতাটি আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে বললেন কবিতা লেখার পাগলামি ছাড়। তোমার না আছে ভাষা না আছে ছন্দ-মাত্রার জ্ঞান। এ সব ছাইপাশ না লিখে বরং ঘরের কাজকর্ম্ম কিছু করো। আর শুধু তাই নয়, আমার স্বামী কবিতার খাতা জ্বালাবার জন্যে উনুনে দিয়েছিলো। আমি উনুন থেকে খাতাটি উদ্ধার করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি।

আমি মনে মনে ভদ্রমহিলার স্বামীর বুদ্ধির প্রশংসা করলুম। নিজের স্ত্রীর প্রতিভা যাচাই করতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তবু ভদ্রমহিলাকে খুশি করবার জন্যে প্রকাশ্যে বললুম আপনার স্বামী জেলাস। উনি চান না যে বাজারের কেউ জানুক যে আপনার লিখবার প্রতিভা আছে। কিন্তু আমি সাহিত্যিক আমি আপনার প্রতিভার মূল্য বুঝতে পারি।

এমনি করে দু-চারবার আলাপ-আলোচনা করবার পর আমাদের মধ্যে প্রেম হৃদ্যতা বেশ গভীর হলো। প্রায়ই আমরা দুজনে এক-সঙ্গে সময় কাটাতুম। অবশ্য কবিতা কিংবা সাহিত্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না। আমি দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতুম। ওকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতুম যে আমি অতি সাধারণ সাহিত্যিক নই। একজন বুদ্ধিজীবি।

তারপর একদিন মেয়েটি এলো না। তার পরিবর্তে এলো ভালবাসার একটি চিঠি। এরপর থেকে আমাদের সম্পর্ক যেন আরো ঘনিষ্ঠ হলো। তারপর আমরা বেশ পর পর দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগলুম। কিন্তু আমাদের গোপন দেখা সাক্ষাৎ বেশিদিন চাপা রইলো না। বাজারে আমাদের দুজনকে নিয়ে কানাঘুসো সুরু হলো।

তারপরে আরম্ভ হলো দুর্যোগ। হঠাৎ একদিন মেয়েটির স্বামী

এসে উপস্থিত হলেন। কোন ভণিতা না করে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন কী ব্যাপার বলুন তো ? আপনি নাকি লুকিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছেন।

আপনার স্ত্রী! আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম। আমার কণ্ঠে থাকে বিস্ময় ; কপটতার সুর।

আপনার স্ত্রী ? কী নাম তার বলুন তো ? প্রতিদিন কতো মেয়ে বিবাহিতা-অবিবাহিতা আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। সবার নাম আমার মনে থাকে না।

আমার জবাব শুনে ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। আমি বলছি কী ? তাঁর চোখে মুখে নিরাশার চিহ্ন ফুটে উঠলো। তিনি এবার শান্ত ধীর গলায় নিজের স্ত্রীর নাম করলেন। তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে আমি খুব জোরে হেসে উঠলুম। ওর স্ত্রীর নামটি পুনরুচ্চারণ করে বললুম উনিই আপনার স্ত্রী। ওর কবিতা লেখার বাই আছে তো ?

ভদ্রলোক যেন এ ধরনের জবাব আমার কাছ থেকে আশা করেননি। তাই বেশ একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন হ্যাঁ তারপর গলার স্বর আরো একটু নীচু করে বললেন আচ্ছা সত্যি করে বলুনতো ? আমার স্ত্রী কী কবিতা লিখতে পারেন ?

আপনার কী মনে হয় ? আমি ইচ্ছে করে ওকে এই প্রশ্ন করলুম।

হয়তো উনি আশা করেছিলেন যে আমি ওর স্ত্রীর লেখার প্রশংসা করবো কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে একটু নিরাশ হলেন। শুধু বললেন আমার মনে হয় না যে উনি লিখিতে পারেন।

আপনি ঠিক কথা বলছেন। না উনি কখনই কবিতা লিখতে পারবেন না। কিন্তু ওর মনে একটা বদ্ ধারণা জন্মে গেছে যে ওর কবিতা লেখার হাত আছে। কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে ওকে দুচারটে ছোট গল্প লিখতে বলুন। অবশ্য আমি আপনার স্ত্রীকে এ কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু জানেন তো মেয়েরা সহজে এ সব কথা বুঝতে চায় না। বুঝতে চায়না যে ওদের লিখবার ক্ষমতা নেই।

যতোই ওকে বলেছি যে আপনি কবিতা লেখার নেশা ছাড়ুন, ততোই ওর কবিতা লেখার নেশা আরো তীব্র হয়েছে। আর ওকে এ সব কথা বলেছি বলে বাজারের সবাই আমার নিন্দে করছে। বলছে সুপ্রকাশ ইজ এ ডেভিল। পরের বউকে নিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে। কস্মিনকালেও আমি পরের বউয়ের সঙ্গে প্রেম করিনে আই এ্যাম এ হ্যাপী ম্যারেড মেন। আমার স্ত্রীর নাম জানেন তো? রাধা বোস। ফিল্ম অ্যাকট্রেস্ বিউটি কুইন অব বেঙ্গল। বলুন যার বউ অতো সুন্দরী সে কী লুকিয়ে প্রেম করতে পারে?

আমার কথাগুলো শুনে ভদ্রলোক যেন অবাক হলেন। আমি এ সব কথা বলছি কী? হয়তো উনি ভেবেছিলেন যে আমি নিজের দোষ স্বীকার করবো কিংবা মাপ চাইবো। হয়তো উনি আমাকে গালমন্দো দেবার জন্যে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন যে, বলবেনঃ স্কাউড্রেল আই ওয়াণ্ট টু লুইপ ইউ। কিন্তু আমার কথা শোনবার পর ওর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরলো না। বেশ নিরাশ হয়ে চলে গেলেন।

পরে শুনেছিলুম যে ওর বউ নাকি লজ্জায় গ্লানিতে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

* * *

ঘড়ির কাঁটা যতোই এগিয়ে যেতে লাগলো ততোই পুরান দিনের কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো। নিজের দোষকে কোন দিন স্বীকার করিনি বরং পরের দোষকে খুঁজে বেড়িয়েছি।

সময় এগিয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর লগ্ন ঘনিয়ে আসছে।

ঘরের জানালা খোলা ছিলো।

এই জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির সব দেখা যায়।

এখনও সন্ধ্যা হয়নি।

পোনে ছটা বাজে।

আমার মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগলো যে দিনান্তের ক্ষীণ মৃদু আলোয় পাশের বাড়ির কেউ নিশ্চয় আমাকে দেখতে পাবে। অন্তত একজন যে আমার পানে তাকাবে এ কথা যেন আমি হলপ করে

বলতে পারতুম। আর সে হলো পাশের বাড়ির মেয়েটি।

আমি প্রথমে মেয়েটির নাম জানবার চেষ্টা করিনি। ওর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়নি। প্রায়ই মেয়েটি এসে বারান্দায় আমার জন্যে দাঁড়াতো। আমাদের দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হতো।

তারপর একদিন মেয়েটিকে ভালো করে জানবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলো। কারণ কয়েকদিন মেয়েটিকে দেখবার পর আমার মনে হলো যে মেয়েটি সুশ্রী, দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো। আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে মেয়েটির সঙ্গে লুকিয়ে আলাপ করতে হবে।

আলাপ করবার সুযোগও মিলে গেলো, মেয়েটি কলেজে পড়তো। প্রতিদিন বাসে করে কলেজে যেতো।

আমি জানতুম কোনদিন সকালে রাধা স্টুডিওতে চলে যাবে। একদিন রাধা খুব ভোরে শুটিং এ চলে গেলো, ও চলে যাবার পর আমি গিয়ে বাস স্টপে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বাস স্টপে এলো। আম্যাক বাস স্টপে দেখে মেয়েটি একটুও অবাক হলো না। আমি দেখতে পেলুম মেয়েটির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

আপনার গাড়ি বুঝি খারাপ হয়ে গেছে? মেয়েটি সরল মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করলো।

না গাড়ি স্টুডিওতে গেছে···আমি হাল্কা গলায় জবাব দিলুম।

প্রথমদিনের আলাপ-আলোচনা ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তারপরে আরো কয়েকবার যখন মেয়েটি আমাকে বাস স্টপে দেখলো তখন সে কিছুটা অবাক হলো। কী ব্যাপার, আমি রোজ রোজ বাস স্টপে এসে দাড়াই কেন?

আপনি বুঝি রোজ বাসে করে অফিসে যান?

আমার জবাবে কিছুটা বিনয়ের রেশ, কিছুটা কৈফিয়তের সুর ছিলো।

আজকাল কী আর গাড়িতে চড়া যায়। পেট্রোলের যা দাম বেড়ে গেছে। আমি বাসে চড়াই পছন্দ করি—

আমি যে বাসে করে কলেজে যাই আপনিও সেই বাসে করে যান কেন বলুন তো?

আমি এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম। বললুম ঃ সঙ্গী ভালো পাই তাই এ বাসে যাই।

আপনি বলছেন কী সুপ্রকাশ বাবু? আপনার মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সঙ্গে একত্রে বাসে যাওয়া তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কী নাম আপনার? আই মীন কী নাম করে তোমাকে ডাকবো?

চামেলি।

কোন কলেজে পড়ো?

কলেজে নয় ইউনিভার্সিটিতে। ফাইন্যাল ইয়ার।

কয়েকদিনের মধ্যে চামেলির সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় বেশ জমে উঠলো।

আমি প্রায়ই গোপনে চামেলির সঙ্গে দেখা করতুম। কিন্তু চামেলির সঙ্গে আমার যে আলাপ পরিচয় হৃদ্যতা হয়েছে এ কথা রাধাকে জানালুম না। জানতে পারলো না যে তাঁর স্বামী লুকিয়ে অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। বাজারে নিন্দুকেরা অবশ্য আমাকে কাসানাভা বলে ডাকতে শুরু করলো। রাধার কানে কোন খবরই গেলো না। কারণ রাধা তাঁর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

অথচ—

অথচ কী?

আমি রাধার চরিত্রকে সন্দেহ করেছি। আর আজ আমি নিজের কানে স্পষ্ট শুনতে পেলুম যে রাধা বলছে আমাকে সে ভালোবাসে। আর ভাগ্যের কী পরিহাস? যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে আর যে স্বামীর চরিত্র বলে কিছু নেই সেই স্বামী তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহ করে। তাকে খুন করবার এক বিরাট পরিকল্পনা করেছি।

আচ্ছা রাধা তুমি কী তোমার স্বামীর বাসনার কথা জানতে? যে তোমার স্বামী সুপ্রকাশ ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়। শহরে তার যথেষ্ট দুর্নাম আছে। আর এই দুশ্চরিত্র স্বামীকে তুমি সরল মনে বিশ্বাস করেছ।

আজ বুঝতে পারলুম যে নারী চরিত্র বোঝা কঠিন। আচ্ছা

রাধা ধরো যদি তুমি আভাস পেতে জানতে পারতে যে তোমার স্বামী লুকিয়ে লুকিয়ে পাশের বাড়ির চামেলির সঙ্গে প্রেম করছে তাহলে কী তুমি তোমার স্বামীকে খুন করবার চেষ্টা করতে? না নিদেন পক্ষে অভিমান কান্নাকাটি ঝগড়া করতে। কিন্তু আমার মতো কঠোর নির্দয় হতে পারতে না অথচ দেখো অন্যায় সন্দেহ করে আমি কতো কঠোর নির্দয় হয়েছিলুম।

আর একটা কথা আমার বলা দরকার, এটা আমার কথা নয় সমস্ত পুরুষদের বক্তব্য। আমরা পুরুষের দল প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমিকার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি। তাদের কাছে আমরা বলি তোমাকে ভালোবাসি অথচ স্ত্রীর আড়ালে ঠিক উল্টো অভিনয় করছি! অন্য মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলছি ইউ আর সোর সুইট ডালিং। আই লাভ ইউ। অন্য মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবার সময় কিংবা তাকে চুমু খাবার সময় আমার একবারও মনে হয়নি যে যার গলা জড়িয়ে ধরে আছি সে আমার স্ত্রী নয়। সে হলো অন্য একটি মেয়ে।

আসল কথা তোমাকে বলবো রাধা আমরা পুরুষের দল এক নারীর দেহে আমাদের জীবনের তৃষ্ণা মেটে না।

* * *

আজ আমি আবার পাশের বাড়ির দিকে তাকালুম। চামেলি কোথায়? ইচ্ছে হলো চীৎকার করে ডাকি চামেলি। কিন্তু আজ আমার গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরল না।

কিছুক্ষণ পরে পাশের বাড়ির বারান্দায় এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখতে পেলুম। আমি বেশ কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে রইলুম। না আমি চিনতে কোন ভুল করিনি। চামেলি বারান্দায় ঘোরা ফেরা করছে। হাঁ, আমি কোন ভুল করিনি সত্যিই চামেলি এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। চামেলিকে দেখে আমার মন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। নিশ্চয় চামেলি আমাকে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে আমার হাত পা বাধা অবস্থায় আমি একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছি। না না আমি শুধু বন্দী নই আজ আমি মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

চামেলি বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলো। আমি নিজের মনে চীৎকার করে বললুম চামেলি তাকাও দেখো তোমার বন্ধু

সাহিত্যিক সম্প্রকাশ আজ মরতে চলেছে। তুমি সম্প্রকাশকে বাঁচাও আজ আমি নিজের বোকামির জন্যে মরতে চলেছি। চামেলি তুমি কী আমাকে দেখতে পাচ্ছো না। তাকাও আমার দিকে···

কিন্তু চামেলি যেন আমার মনের কথাগুলো শুনতে পেলনা বরং বারান্দার রেলিং এ ভর দিয়ে রাস্তার পানে তাকালো।

তুমি কী দেখছো চামেলি ?

বাঁদর নাচ দেখছো······

মাথাটা নীচু করো না। মুখ তুলে তাকাও। আমাকে দেখতে পাবে······

কিন্তু চামেলি আমাকে দেখতে পেলো না। ঘরের ভেতর চলে গেলো।

আমি আবার মরিয়া হয়ে জোর গলায় বলবার চেষ্টা করলুম··· তুমি আমাকে মৃত্যুর সামনে রেখে চলে যেওনা। আমার দিকে তাকাও—পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক সম্প্রকাশকে বাঁচাও···

এই জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির সব দেখা যায়। এখনও সন্ধ্যা হয়নি। পৌনে ছ'টা বাজে। আমার মনে একটা ক্ষীণ আশা এলো যে দিনান্তের মৃদু আলোয় পশের বাড়ির কেউ নিশ্চয় আমাকে দেখতে পাবে।

আমাদের ঐ পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে থাকতো। কী নাম তার জানিনে। প্রায়ই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো এবং আমাদের দুজনের বহুবার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে।

মেয়েটি দেখতে সুশ্রী। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো।

আমার বহুবার ইচ্ছে হয়েছিলো যে, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবো। আমরা যারা পুরুষ, বিয়ের পর আমাদের পর নারীর প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাই। অথচ স্ত্রীর কাছে ভিজে বেড়াল সেজে থাকি।

আমার যে পাশের বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করবার গোপন বাসনা হয়েছিল একথা কোনদিন রাধার কাছে প্রকাশ করিনি।

অথচ—

অথচ কী ?

আমি রাধার চরিত্রকে সন্দেহ করেছি কিন্তু আজ রাধা স্পষ্ট গলায় বললো যে, সে আমাকে ভালোবাসে।

রাধা তুমি কী তোমার স্বামীর গোপন বাসনার কথা জানতে? তুমি কী জানতে যে তোমার স্বামী ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়। অথচ তুমি সরল মনে আমাকে বিশ্বাস করেছ।

সত্যিই নারী চরিত্র বোঝা দুষ্কর। রাধা তুমি যদি জানতে যে আমি পাশের বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছি তাহলে কী তুমি আমাকে খুন করবার পরিকল্পনা করতে।

না, বড়োজোর কান্নাকাটি ঝগড়া···কিন্তু আমি তোমাকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছিলুম।

হ্যাঁ, আজ তোমাকে মরবার আগে স্পষ্ট কথা বলে যাচ্ছি।

আমরা পুরুষের দল এক নারী দেহে আমাদের তৃষ্ণা মেটে না।

আবার আমি পাশের বাড়ির দিকে তাকালুম।

মেয়েটি কোথায়?

ঐ যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কী নাম তোমার?

আরতি—অলকা না অশোকা? শোন, আরতি আমি জানি তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ।

শোন অলকা কতোগুলো বদমায়েশ লোক এসে আমাকে ঘরের ভেতর আটকে রেখেছে।

তুমি একবার আমার দিকে তাকাও। প্রতিদিন তো তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করতে। আজ কথা বলছো না কেন?

অলকা তুমি কী আমাকে দেখতে পাচ্ছো না। আজ রাধা বাড়িতে নেই। তুমি আমার সঙ্গে কথা বললে কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। কেউ জানতে পারবে না যে আমরা দু'জনে গোপনে কথা বলছি। আজ তাকাও আমার দিকে।

তুমি তাকাচ্ছ না কেন?

বুঝেছি তোমার নাম অলকা, আরতি অশোকা নয়, তাই তুমি আমার কথা শুনছো না। আজ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোন

ক্ষমতা নেই। ডাকাতগুলো আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে।

তাকাচ্ছ না কেন ?

তুমি রাস্তার বাঁদর নাচ দেখছো। মাথাটা নীচু করো না। মুখটা তোল। আমাকে দেখতে পাবে।

কিন্তু মেয়েটি আমাকে দেখতে পেলো না। ঘরের ভেতর চলে গেলো।

আমি আর একবার জোর গলায় বলবার চেষ্টা করলুম ; তুমি আমাকে ফেলে ভেতরে যেওনা! আমার দিকে তাকিয়ে দেখো। পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক সুপ্রকাশকে বাঁচাও।

টিক-টিক-টিক···

ঘড়ির আওয়াজ যেন আরো স্পষ্ট হচ্ছে।

ছটা বাজতে আরো তেরো মিনিট বাকি আছে।

মাত্র তেরো মিনিট।

অসম্ভব !

আর তেরো মিনিট মাত্র আমার জীবনের পরমায়ু। আমার মনে হলো আমি ডুলিতে চেপে মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছি। আমার স্ত্রীকে খুন করবার চেষ্টা করছিলুম কিন্তু আজ আমি নিজেকে খুন করলুম।

আচ্ছা মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হলে আমি কী করবো ? কী বলবো ?

বলবো, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইনি ! কিন্তু তবু আজ আমাকে তোমার কাছে আসতে হলো। দোষটা আমার। নিজের স্ত্রীকে খুন করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ফল হলো ঠিক উলটো। আজ আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। মৃত্যু আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমি তো এই সুন্দর ভুবনে আরো কয়েকদিন বেঁচে থাকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তুমি আমাকে থাকতে দিলে কৈ ? মৃত্যু তুমি আমাকে শাস্তি দিচ্ছো। তুমি যা খুশি বলো। আমি তোমার কথার কোন জবাব দেবো না। শুধু এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে মানুষ যখন পশু হয় তখন সে তার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমিও পশু হয়েছিলুম।

হঠাৎ বাইরে থেকে কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলুম !

কে ?

রাধা কী আবার বাড়িতে ফিরে এলো ?

না রাধা কড়া নাড়বে কেন ?

ওর কাছে দরজার চাবি আছে। সোজা ঘরে ঢুকবে।

চিঠি—

বাইরে থেকে পিয়নের গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম।

প্রায় প্রতিদিন এই সময়ে চিঠি দিতে আসে। কিন্তু কোনদিন তার দিকে তাকাইনি কিংবা তার সঙ্গে কথা বলবার কোন ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু আজ পিয়নের সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছেটা প্রবল হলো।

পিয়ন এদিকে এসো, তাকিয়ে দেখো। ওরা আমাকে বন্দী করে রেখেছে। না, না, বন্দী নয়···ওরা আমাকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছে। না, না আমি মিথ্যে কথা বলছি। আসলে আমিই আমার স্ত্রীকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছিলুম···কিন্তু আমার সমস্ত প্ল্যান আয়োজন ভেস্তে গেলো। আজ নিজের ফাঁদে আমি নিজেই ধরা পড়েছি।

চিঠি—

আবার পিয়ন জোরে ডাকলো।

কিন্তু আজ কেউ চিঠি নেবার জন্যে গেল না।

কে দরজা খুলবে ? আমি ঘরে বন্দী হয়ে আছি। রাধা বাইরে গেছে। আর চাকর-বাকরেরা বাড়িতে নেই।

ভাবলুম পিয়ন হয়তো বারবার কড়া নাড়বে। পাড়া-প্রতিবেশীরা কড়া নাড়ার এবং পিয়নের ডাক শুনে চলে আসবে। দেখবে বাড়ির দরজা ভেঙে বাড়ির ভেতর ঢুকবে। তারপর ঘরের ভেতর ঢুকে পাবে আমার হাত পা বাঁধা। ওরা আমাকে মুক্ত করবে।

চিঠিগুলো বাইরে রেখে গেলুম—এই বলে পিয়ন চলে গেলো।

আমি জোরে চীৎকার করে বলবার চেষ্টা করলুম, পিয়ন, তুমি যেওনা। আরো জোরে কড়া নাড়ো। পাড়া প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করো।

টিক—টিক—টিক···

ঘড়ি ডাকছে।

ঘড়ি বলে। মৃত্যু আমাকে ডাকছে।

বুঝেছি আমার বাঁচবার কোন আশা নেই।

প্রতি মুহূর্তে, প্রতি সেকেণ্ডে আমি মৃত্যুপুরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

দুধওয়ালা…

বাইরে থেকে দুধওয়ালার ডাক শুনতে পেলুম। অন্যদিন দুধওয়ালার ডাক শুনলে আমি বিরক্তবোধ করতুম…কিন্তু আজ দুধ-ওয়ালার ডাক আমার কানে মিষ্টি শোনাল।

দুধ নিয়ে যান—আবার দুধওয়ালা ডাক দিয়ে বললো।

শোন দুধওয়ালা বাড়িতে কেউ নেই। শুধু আমি একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছি। শোন দুধওয়ালা একবার পাশের রাস্তা দিয়ে আমার দিকে তাকাও।

আবার দুধওয়ালা জোরে কড়া নাড়লো।

দুধওয়ালা, তুমি বৃথা চেষ্টা করছো। আজ তোমাকে দরজা খুলে দেবার কেউ নাই।

দুধওয়ালা আমাকে নিরাশ করলো। কিছুক্ষণ বাদে চলে গেলো।

চাকরগুলো হয়তো সিনেমায় গেছে। সন্ধ্যার বাতিগুলো জ্বলে উঠবার পর বাড়িতে ফিরে আসবে।

সন্ধ্যার বাতিগুলো জ্বলে উঠবে কখন? সন্ধ্যা 'ছ'টার পর।

ঐ ছ'টার সময় ঘড়িটা টিক করে উঠবে তারপর…

সর্বনাশ! আমি কী করেছি…নিজের পায় নিজে কুড়াল মারলুম।

আপনারা জীবনে নিশ্চয় হয়তো অনেক ভুল করেন, না না ঠিক ভুল করেন বলবো না…বলবো দুষ্কর্ম করেন কিন্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আপনারা কী প্রাণ বিসর্জন দেন! কক্ষণো না…

ছ'টা বাজবার আর সাতমিনিট বাকি আছে।

মাত্র সাত মিনিট।

উঃ আজ ঘড়ির কাঁটা কী দ্রুতগতিতে চলছে হয়তো ইলেকট্রিসিটি ঘড়ির কাঁটাকে জোরে চালাচ্ছে···

রাধা আজ মরবার আগে তোমার কাছে কয়েকটি কথা স্বীকার করতে চাই। এ আমার কথা নয়। এ হলো সমস্ত পুরুষের মনের অব্যক্ত কথা। জানি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে অকপটে এই স্বীকারোক্তি করবে না। কিন্তু আজ আমি মরবার আগে তোমার কাছে সব কথা খুলে বলবো। হয়তো জীবিত থাকলে আমাদের চরিত্রের দোষত্রুটি, দুর্বলতার কথাগুলো উল্লেখ করতুম না। কিন্তু আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে তোমাকে বলছি যে আমরা পুরুষের জাত, আমরা কোন ধাতুতে তৈরি।

আমরা লোভী, স্বার্থপর আমাদের কাছে নিজেদের জীবন, সুখ-সুবিধেই সর্ব চাইতে বড়ো। আজ আমরা তোমাদের নিজেদের সঙ্গী করে নিই তার কারণ আমরা ক্লান্ত আর তোমরা আমাদের কাছে ধরা দাও, কারণ তোমরা কৌতূহলী···কিন্তু যদি কখনও জীবনের দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেষ করো তাহলে দেখতে পাবে যে পুরুষের দল পেয়েছে অনেক—দিয়েছে কম।

আমরা হিংস্র, বন্যপশু···তাই আমরা কপটতা করি, মিথ্যে কথা বলি, আর খুন করি। আমরা মুখে হাসি কিন্তু অন্তরে আমরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরি। আমরা প্রতিদিন লোভী পশুর মতো সুযোগ খুঁজি, কী পাবো কোথায় পাবো···আর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হিংস্র হয়ে উঠি।

এই যে সংসার দেখছো এতো বিবাদ কলহ এই যে দেখছো আমরা একে অন্যকে ধ্বংস করছি, খুন করছি তার সঠিক কারণ কী বলতে পারো। বলতে পারো আমরা কেন প্রবঞ্চনা করি···কেন দুর্বলকে অত্যাচার করি। সামান্য লোভের জন্যে, দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। কিন্তু এই লোভ, দেহের ক্ষুধা কিছুই আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করে না।

রাধা, যে ভগবান আমার হিংস্রতাকে দূর করতে পারে না, বরং আমার মনের কামনাকে আরো তীব্র করে তোলে, সেই ঈশ্বরকে আমি স্বীকার করিনে। যে ধর্ম আমার চঞ্চল মনকে শান্ত করে না···সে

ধর্ম নয়···কপটতা প্রবঞ্চনা···। আর এই মিথ্যে প্রবঞ্চনার জাল সৃষ্টি করেছে কে? আমরা, পুরুষের দল। নিজেদের শক্তিশালী করবার জন্যে এই অস্ত্র তৈরি করেছি যে অস্ত্র দিয়ে আমরা দুর্বলকে বশ করেছি।

আমরা পুরুষের দল নারীদের কাছ থেকে কী চাই? ভালোবাসা! রাধা আমাদের ঐ মিষ্টি বুলিতে কখনও ভুলে যেওনা। আমাদের কাছে ভালোবাসা ক্ষণিকের জলের বুদবুদের মতো। আমাদের প্রধান আকাঙ্ক্ষা তোমাদের দেহ। যেদিন তোমাদের ঐ দেহের ক্ষুধা মিটে যায় সেদিন আমরা আবার অন্য শিকার খুঁজি। আর শিকার করতে গিয়ে আমরা যখন বাধা পাই তখন আমরা হিংস্র হয়ে উঠি।

রাধা তোমার স্বামী সুপ্রকাশও ওদের একজন। আজ তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করবো যে তোমার প্রতিভা যশঃ আমার মনে হিংসা সৃষ্টি করেছিলো। যখন ভাবলুম যে আমার মতো আর একটি পুরুষ তোমাকে পাবার চেষ্টা করছে; তখন আমার মনের কামনা, লোভকে আরো তীব্র করে তুললো। কখনও যাচাই করবার চেষ্টা করিনি যে আমি তোমাকে কী দিয়েছি। একবারও তোমার মনের আকাঙ্ক্ষাকে জানবার চেষ্টা করিনি। শুধু ভেবে দেখেছি আমি কী পেলুম···আমি কী হারাব···

ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় আজ ঘড়ির কাঁটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হয়তো বলবার চেষ্টা করছে: মূর্খ, দেখ আকাঙ্ক্ষার পরিণতি কী? কী চেয়েছিলি, আর কী পেলি?

বাইরের আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সর্বনাশ। আর একটু বাদে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠবে।

এবার সবাই বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু ওরা কী জানবে যে লোভীর সাজা কী? স্ত্রীকে অবিশ্বাস করলে স্বামীকে কী সাজা পেতে হয়।

ওরা জানবে কী করে? আমি মরে গেলে দুনিয়ার সবাই বলবে যে গুণ্ডারা সুপ্রকাশকে হত্যা করেছে। কিন্তু কেউ টের

পাবে না যে সুপ্রকাশের মৃত্যুর কারণ হলো সুপ্রকাশ নিজে। সে নিজেকে হত্যা করেছে!

আজ বুঝতে পারলুম যে মৃত্যুর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

বাইরের আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

এবার সবাই ঘরে ফিরে যাবে।

পৃথিবী শান্ত হবে—

—আর শান্ত হবে সুপ্রকাশের কণ্ঠস্বর।

ভাবলুম দিনের আলো নিভে যাবার আগে দু'চোখ ভরে জগৎটাকে দেখে নিই।

এর পরতো আর কখনও পৃথিবীর আলো দেখতে পাবো না।

রাস্তাগুলো নিশ্চয় নির্জন নিরালা হয়েছে। সবাই বাড়ি ফিরছে।

আমার বাড়ির সামনে একটি ছোট মাঠ।

মাঠে চার-পাঁচটি ছেলে ফুটবল খেলছে। ওরা কী জানে যে পাঁচ মিনিট বাদে ওদের চোখের সামনে একটি বোমা ফাটবে আর সাহিত্যিক সুপ্রকাশ সেই বোমার আঘাতে মারা যাবে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

হটাৎ ফুটবলটি এসে জানালার গায়ে লাগলো।

জানালাটি খুলে গেলো।

জানালা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাঠের বেশ খানিকটা দেখতে পেলুম।

কেউ নেই।

শুধু অশান্ত ছেলেগুলো মাঠে খেলছে।

ওরা কী আমাকে দেখতে পাবে?

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকালুম।

চার মিনিট।

সন্ধ্যার আলো ক্রমেই ঘন হচ্ছে।

ফুটবলটি নিতে একটি ছোট ছেলে জানালার কাছে এগিয়ে এলো।

আমি ছেলেটির দিকে তাকালুম। হয়তো ছেলেটি আমাকে দেখতে পাবে।

খোকা একবার জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকাও। ওরা আমাকে আটকে রেখেছে।

আর আমার সামনে রয়েছে এক মারাত্মক বোমা! একটু বাদে বোমা ফাটবে আর আমি মরবো। আজ আমি বড়ো নিঃসহায়।

শোন খোকা, তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও। সবাইকে ডেকে বলো যে ডাকাতরা আমাকে এই ঘরে বন্দী করে রেখেছে।

আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো না খোকা। ছেলেটি এবার জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিলো।

আমাকে দেখতে পেলো।

দেখতে পেলুম ছেলেটি আমার দিকে তাকাচ্ছে।

কী আনন্দ, কী মজা···

ছেলেটি আমাকে দেখতে পেয়েছে।

ভগবান আমি তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানিনে।

ভগবান কে?

ঐ শিশুই আজ আমার ভগবান।

আমাকে তুমি দেখতে পেয়েছ খোকা।

আমার হাত পা বাঁধা দেখে বিস্মিত অবাক হয়েছ।

হ্যাঁ আমি জানি তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ।

কারণ আমি মাথা নাড়লুম।

তার জবাবে তুমিও মাথা নাড়লে।

জানালা দিয়ে তুমি তোমার বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছো। অমন করে তাকিও না। আমি ভূত নই, মানুষ। আমার নাম সুপ্রকাশ সাহিত্যিক। ফিল্ম অ্যাকট্রেস রাধা বোসের স্বামী।

শোন খোকা, আজ আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

খোকা, আমার হাতে আর সময় নেই! দেখতে পাচ্ছো না। ঘড়ির কাঁটা কতো দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। একটু বাদে ঐ কাঁটা

ছ'টার ঘরে গিয়ে পেঁছুবে আর তারপরেই শুনতে পাবে দুম করে এক বিরাট শব্দ। বোমা ফাটবে।

ছটা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি। তুমি দেরি করো না। চীৎকার করে তোমার বাবা মাকে ডাকো। ওরা এসে দেখুক ডাকাতরা আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে। দেরি করলে আমি আর দানব ঘড়িটাকে আটকে রাখতে পারবো না। শুনতে পাচ্ছো না, ঘড়িটা আমাকে ধমকাচ্ছে।

টিক-টিক-টিক···

আর দুই মিনিট···

তারপরেই অ্যালার্মের ঘড়িটা বেজে উঠবে।

আমার মৃত্যু হবে।

তুমি কী ভাবছো খোকা ?

চীৎকার করছো না কেন, কথা বলো, পাড়ার সবাইকে চীৎকার করে বলো, আমাকে ঐ ঘড়িটা খুন করছে।

ভাবছো আমি পাগল।

আমি মাথা নাড়ছি বলে আমাকে পাগল ঠাউরেছ। না তুমি হয়তো ভেবেছ আমি চোর। বেশ তাহলে চীৎকার করে বলো রাধা বোসের বাড়িতে চোর এসেছে। ভাবছো আমি মাথা নেড়ে তোমাকে মুখ ভেঙাচ্ছি। তাই তুমিও মাথা নাড়ছো মাথা ভেঙাচ্ছো···

আমি কী করবো বলো ? ওরা আমাকে বেঁধে রেখেছে।

ও কে ?

তোমার মাকে বলো যে তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছ।

শুনুন খোকার মা, আমার দিকে দয়া করে একবার তাকান।

আমার নাম সুপ্রকাশ, পশ্চিমবাংলার একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কী বলছেন আপনি আমার নাম শোনেননি। বেশ তাহলে আপনাকে আমার অন্য আর একটি পরিচয় দিচ্ছি। আমার স্ত্রী রাধা বোসের নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। পশ্চিমবাংলার খ্যাতনামা অভিনেত্রী। আপনাদের কাছে উনি সেক্সকুইন নামে পরিচিতা। পাড়ার ছেলেরা ওকে যতোটা জানে মেরিলিন মনরোকে

তার বেশি জানে না। তাই আমার মনে হয়, এখানে জেন্টেলী অথবা জিনালোলো-ব্রিজিডা বার্দ‌ং বা অন্য কোনো সেক্সী অ্যাকট্রেসের নাম ব্যবহার করলে ভালো হয়। ওকে মেরিলিন মনরো বলে ডাকে। আমি তাঁর স্বামী সুপ্রকাশ। না আজ স্ত্রীর পরিচয় দিতে আমার লজ্জা নেই। গর্ব করে বলতে পারি, আই এ্যাম দি হাজব্যাণ্ড অব রাধা বোস।

শুনুন আপনি দয়া করে আমাকে বাঁচান। দেখুন হিংসেয় জ্বলে পুড়ে আমার স্ত্রীকে খুন করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। আমি নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে এনেছি। আমার অপরাধ স্বীকার করছি।

ওকী আপনি চলে যাচ্ছেন। শুনুন খোকার মা, জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকান। কিন্তু খোকার মা আমার দিকে তাকালেন না। আমি শুনতে পেলুম যে, মা ছেলেটিকে বকছেন জানলার দিকে তাকিয়ে কী মাথা নাড়ছিস। সন্ধে হয়ে গেলো, চল বাড়ি।

এই বলে ভদ্রমহিলা ছেলেটিকে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন। একবারও আমার দিকে তাকালেন না।

আমার বাঁচবার শেষ আশাটুকুও নিভে গেলো। আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

হৃৎপিণ্ডটা চলছে।

টিক-টিক-টিক···

না না ওটা ঘড়ির কাঁটা।

আর মাত্র দুই মিনিট।

মাথার ভেতর এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলুম।

হঠাৎ আমার মনে হলো আমার যেন সমস্ত দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আজ আমার কানে শুধু একটি কথাই বাজাতে লাগলো।

মৃত্যু···মৃত্যু···মৃত্যু···

ছটা বাজতে আর দেড় মিনিট বাকি।

টিক-টিক-টিক···

ভগবানের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা বিদ্বেষ হলো।

সংসারে ভগবান বলে কিছু নেই। আমি এতো করে কাতর

স্বরে ভগবানকে ডাকলুম। কিন্তু ভগবান আমার প্রার্থনা শুনলেন না।

সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হয়ে এলো।

ওগুলো কী?

আকাশের তারা?

আমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছি।

নইলে রাস্তার বাড়িগুলোকে আকাশের তারা বলে ভাববো কেন?

ঘড়ি চলছে টিক-টিক···

আর মাত্র এক মিনিট সময় আছে।

এক মিনিট, ষাট সেকেণ্ড।

টিক—টিক—না প্রতিটি সেকেণ্ডই গোনা ভালো।

এক—দুই—তিন···

রাধা আজ মরবার আগে তোমার কাছে মাপ চাইছি। নিজের অপরাধ স্বীকার করছি। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলুম। মনে মনে আশা করেছিলুম যে আমরা দু'জনে সুখে ঘর-সংসার করবো। কিন্তু তোমার খ্যাতি, যশ, প্রতিভা তোমার দেহ সৌন্দর্য আমার মনে হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিলো। আর সেই হিংসার বিষে বিরাক্ত হয়ে আমি তোমাকে খুন করবার প্ল্যান করেছিলুম। তুমি আমাকে মাপ করো···চার···পাঁচ···ছয়···

ঘড়ির কাঁটা বড়ো জোরে এগিয়ে চলেছে। একটু আস্তে আস্তে চলো। আমাকে আরো খানিকটা সময় বাঁচতে দাও।

আজ যদি আমি হঠাৎ মরে যেতুম। আমার হার্টফেল করতো তাহলে আমি অতো দুঃখ পেতুম না। কিন্তু আজ আমি আমার নিজের পাতা মৃত্যু-ফাঁদে পড়ে তিলে তিলে প্রতি সেকেণ্ডে-সেকেণ্ডে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

সাতাশ—আঠাশ—ত্রিশ সেকেণ্ড। আর মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড বাকি আছে। তারপরেই ঐ বোমাটা ফেটে উঠবে। কিন্তু ঐ বোমা বিস্ফোরণ দেখবার জন্যে আমি বেঁচে থাকবো না। হয়তো কাল সকালে কলকাতার কাগজগুলোতে বেরুবে রাধা বোসের স্বামী সুপ্রকাশের মৃত্যু হয়েছে।

চল্লিশ—পয়তাল্লিশ পঞ্চাশ···

আর মাত্র দশ সেকেণ্ড আমার জীবনের আয়ু।

আমার মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হলো যেন আমার শ্বাস পড়ছে না।

চোখের মণি দুটো নড়ছিলো।

মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু।

পঞ্চান্ন, ছাপান্ন,

ও কীসের শব্দ?

গাড়ির।

বাড়ির সামনে জানি কার গাড়ি এসে দাঁড়াল।

রাধার!

হ্যাঁ। রাধা আর অমিত গুপ্ত ফিরে এসেছে। ফিরে তো আসবেই।

নিজের স্বামীর মৃত্যু নিজের চোখে দেখুক। বিধাতার প্রহসন কী দেখুন?

যে স্ত্রীকে আমি নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিলুম আজ সেই স্ত্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুকে নিজের চোখে দেখতে পাবেন। সিনেমার অভিনয় নয় বাস্তব ঘটনা।

একবার যদি রাধা বোস এই ঘরে আসতো তাহলে হয়তো ইলেকট্রিসিটির মেন সুইচ বন্ধ করে দিতে পারতো। ঘড়িটা চলতো না।

টিক—টিক—টিক···

সাতান্ন, আটান্ন, ঊনষাট···

আর এক সেকেণ্ড।

আমি শুনতে পাচ্ছি যে রাধা আর অমিত গুপ্ত বাড়ির ভেতর ঢুকছে।

বিদায় পৃথিবী, বিদায় সমাজ, বিদায় রাধা।

আমাকে তুমি ভুল বুঝো না রাধা। আমাকে তুমি মাপ করো।

রাধা আমি তোমাকে ভালোবাসতুম।

আই লাভ ইউ ডার্লিং।

টিক—টিক—টিক···

আরো দুটো টিক শব্দ হবে।

তারপর এই সমস্ত ঘরবাড়ি কেঁপে উঠবে।

টিক।

আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্যে চোখ বুজলুম।

টি···

হঠাৎ আমার কানে এক প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এলো।

তীব্র আওয়াজ।

বাইরের জগৎটা অন্ধকার হয়ে গেলো। ঘন কালো পৃথিবী। আঁধারে ঢাকা। কিন্তু আমার মনে হলো আমি চেতনা হারাইনি।

বেঁচে আছি।

চীৎকারের রেশ আমার কান থেকে মিলিয়ে যায়নি।

সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে বলছে, লোডশেডিং—ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে-বাতি নিভে গেছে।

বুঝতে পারলুম ঘড়িটা চলেনি। বন্ধ হয়ে গেছে।

তাই বোমাটা ফাটলো না। আমি বেঁচে গেলুম।

কাসিনো

মণ্টিকার্লো' কাসিনো রুলেটের ঘর। রুলেটের ভাগ্যচক্রের সামনে একটা ছোট চেয়ারে বসে রুলেট খেলার পরিচালক ক্রুপিয়ের চিৎকার করে ডাকছেন, চলে আসুন, চলে আসুন আর দেরি করবেন না, সময় নেই, ভাগ্য পরীক্ষা করুন।

তারপরেই রুলেটের কাঁটা ঘুরতে শুরু করল। আর ভাগ্য যাচাই করবার জন্যে জুয়াড়ির দল মোটা টাকার বাজি রাখতে লাগল। এই ভাগ্য পরীক্ষায় কেউ হারল, কেউ বা জিতল। আবার ক্রুপিয়ের চিৎকার শুরু হলো—আসুন, খেলুন, ভাগ্য যাচাই করুন।

মণ্টিকার্লোর এই জুয়ার আসর পৃথিবী বিখ্যাত। ঐ রুলেট টেবিলে টাকার বাজি খেলতে পৃথিবীর ধনকুবেরেরা সবাই যান। বিচিত্র চরিত্রের লোক, বিভিন্ন দেশের বাসিন্দা, বিভিন্ন ভাষা। দিনে যারা ব্যাবসা করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন কিংবা আরবদেশের টাকার কুমির—সবাইকে রাত্রিবেলায় জুয়ার তীর্থক্ষেত্রে দেখতে পাবেন। আর এই আসরে ধর্মের বালাই নেই, রাজনীতির গন্ধ নেই, সামাজিক স্তরের পার্থক্য নেই।

মণ্টিকার্লোর ঐ জুয়ার আসরে খেলতে গেলে সঙ্গে সুন্দরী বান্ধবী থাকা চাই।...অর্থাৎ ফরাসী ভাষায় যাকে বলা হয়ঃ "লেফাম জলি"—সুন্দরী নারী।

কাসিনোর ঘরে ঢুকেই টাকা ভাঙিয়ে "চীপস" (গুটি) কিনতে হয়। আর সেই চীপস দিয়ে রুলেট খেলতে হবে।

রুলেট এক বিচিত্র খেলা। একটা ছোট টেবিলে এক থেকে চৌষট্টি নম্বর লেখা আছে, লাল কালো রঙে বিভক্ত। আর টেবিলে একটি ছোট কাঁটা আছে। আপনাকে ৬৪ সংখ্যার যে-কোন নম্বরে চীপস রাখতে হবে। আর রুলেটের কাঁটা ঘুরে যদি আপনার নম্বরে

এল তবেই আপনি বাজি জিতলেন। আর যদি কাঁটা অন্য কোনো ঘরে গিয়ে থামল তবে সেই যাত্রায় আপনি ভাগ্য পরীক্ষায় পরাজিত হলেন। একবার, দুবার হয়ত মাঝ রাত্রের মধ্যে আপনি হবেন লাখপতি কিংবা পথের ভিখারি। রুলেট খেলার তীব্র নেশা সহজে ছাড়া যায় না।

আপনি রুলেট টেবিলের সামনে জুয়া খেলছেন, আর আপনার বান্ধবী পাশে দাঁড়িয়ে হুইস্কির গ্লাস হাতে করে আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের খেলা দেখছে। কারণ আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে তারও ভাগ্য জড়িয়ে আছে।

রুলেট টেবিলের আশেপাশে মৌমাছির মতো আরও অনেক বন্ধুহীন অপ্সরা ঘুরছে। এরা রুলেট খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এবার কোনো ধনীবন্ধু পাকড়াও করবার ফিকিরে আছে। বন্ধু যোগাড় করতে বেশি সময় লাগে না। ব্যবসায়ী ধনকুবের, ধনী মহারাজারও অভাব নেই, যাঁরা নিত্যি নতুন পালটাবার মতো বান্ধবীর পরিবর্তন করেন। শুধু এ রাতের শেরাজাদী, রুলেট টেবিল, তারপরেই শয্যাসঙ্গিনী। ব্যস, সকাল হলেই একে অন্যের কাছে অপরিচিত…। শুরু হয় গতানুগতিক জীবন। আর দিনের বেলায় বান্ধবী বিছানায় শুয়ে ঘুমোয়, আর স্বপ্ন দেখে আজ রাত্রে সে কোন রাজপুত্তুরকে পাকড়াও করবে।

সোনিয়া মন্টিকার্লোতে তার ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসেছিল। সোনিয়া বিদেশী ললনা নয়, স্রেফ বাঙালী পূর্ববঙ্গের মেয়ে। কিন্তু জন্ম থেকে লণ্ডনে পাব্লিক স্কুলে পড়াশুনা করেছে। শাড়ি পরে না। আর পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে খুবই ছোট স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়।

পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো দেহ-সৌন্দর্য সোনিয়ার আছে। লণ্ডনে তার বয় ফ্রেণ্ডের অভাব ছিল না। কিন্তু হালে তার মাসীকে সঙ্গে করে ফ্রান্সে এসেছে। পারীতে কিছুদিন কাটিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের নীস্ শহরে এসেছে। উদ্দেশ্য দক্ষিণ ফ্রান্সের সৌন্দর্য এবং কান্ ফিল্ম উৎসবে গিয়ে নতুন নতুন নিষিদ্ধ ছবি

দেখবে। মণ্টিকার্লোর নাম সোনিয়া বহু উপন্যাসে পড়েছে, কিন্তু মণ্টিকার্লোর আসল রূপ দেখেনি। দিনে মণ্টিকার্লো নিঃঝুম হয়ে থাকে, যেন ছোট একটি গ্রাম। আর রাত্রি হলে সজাগ হয়ে ওঠে। তখন ঐ কাসিনো হয় রূপসীদের আর জুয়াড়িদের লীলাসক্ষেত্র।

রুলেটের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সোনিয়া তার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। তার ব্যাগের পুঁজি ছিল দশ হাজার ফ্রাংক (প্রায় বার হাজার টাকা)। মাসী তাকে নীস্, মণ্টিকার্লো ঘুরে বেড়াবার জন্যে এই টাকা দিয়েছিলেন। সোনিয়া ট্যুরিস্ট বাসে করে সোজা মণ্টিকার্লোতে চলে এল। আর জুয়ার শহরে এসে তার বিড়ম্বনা শুরু হলো। রাত দশটা পর্যন্ত সে অনেক টাকা বাজি জিতেছিল, প্রায় হাজার পঞ্চাশ ফ্রাংক। কিন্তু টাকার লোভ সোনিয়া সামলাতে পারল না। তার জুয়ো খেলার নেশা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। আর তিন হাজার ফ্রাংকের পুঁজি এসে একশ ফ্রাংকে দাঁড়াল।

আজ রাত্রে বেরুবার আগে মাসী সোনিয়াকে বার বার সতর্ক করে বলেছিলেন : আর যাই কর না কেন বাপু, খারাপ কোন কাজ করবে না, খারাপ কিছু দেখবে না, খারাপ কোন কিছু বলবে না। আর মণ্টিকার্লোর রুলেট টেবিল বড় বিপজ্জনক জায়গা। মেয়ে শিকার খুঁজতে জুয়াড়ি স্মাগলার স্পাই-এর দল টেবিলের চারপাশে ঘুরছে। অপরিচিত কারু কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য নেবে না। ওরা যদি ড্রিংকস্ কিংবা ডিনার খেতে বলে তবে অস্বীকার করবে। ওদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুবিধেজনক নয়, ক্ষতিকারক।

সোনিয়া অবশ্যি মাসীকে ঘুম পাড়িয়ে সোজা মণ্টিকার্লোতে চলে এসেছে। বাঁধাধরার নিয়মের মধ্যে মানুষ হয়নি বটে, তবে নিষিদ্ধ কাজ সে কখনই করেনি। আরও সহজ ভাষায় বলা যায় কোন প্রকার নিষিদ্ধ কাজ করবার সুযোগ সে পায়নি। কিন্তু আজ রাত্রে মণ্টিকার্লোর কাসিনোতে এসে তার নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গ বলে মনে হলো। এখানে বাধা দেবার কেউ নেই, উপদেশ দিতে কেউ এগিয়ে আসে না···

আজ মণ্টিকার্লোর কাসিনোতে সোনিয়ার জীবন উপভোগ করবার আর একটি গৌণ কারণ ছিল। লণ্ডনে থাকাকালীন সে

তার আত্মীয়-স্বজনের বাবা-মার চিঠিপত্রে কানাঘুষোয় জেনেছিল যে শীগগিরই তাকে দেশে ফিরতে হবে। আর দেশে ফিরে যাবার প্রধান কারণ হলো যে তার বাবা-মা বিয়ের বন্দোবস্ত করেছেন। হাজার হোক বাঙালীর মেয়ে যতোই মিনি স্কার্ট বা মিনিলিস পরুক আর চুল ছোট করে ছাঁটুক না কেন পাত্রীর স্বামী হওয়া চাই নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ। সোনিয়া অবশ্যি এই বিয়ের ব্যাপারে কোন মন্তব্য প্রকাশ করবার সুযোগ পায়নি। কারণ হঠাৎ একদিন আমেরিকা থেকে তার মাসীমা এসে হাজির হলেন। বললেন ঃ চল তোকে আমার সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে হবে।

কারণ? বিস্মিত অবাক হয়ে সোনিয়া তার মাসীমাকে দেশে ফিরে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করল।

দেশে ফিরে যাবি না তো কোথায় যাবি? বিলেতে তো বেশ কয়েকটা বছর কাটালি। ইউনিভার্সিটির পড়াশুনার পাটও চুকল··· এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো কনের পিঁড়িতে গিয়ে বস···

মাসীমা সোনিয়াকে বাঙালী মেয়ের বিয়ের প্রয়োজনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে তাঁর কথার শেষে ছোট একটি লেজুড় জুড়ে দিলেন, তোর বাবা একটি ভাল পাত্তর যোগাড় করেছেন। ফরেইন সার্ভিসের ছেলে বিদেশে দূতাবাসে কাজ করে।

'দূতাবাসের কর্মচারি' নাম শুনে সোনিয়ার মনটি বিগড়ে গেল। কারণ দূতাবাস সম্বন্ধে সোনিয়ার কোনদিনই উচ্চ ধারণা ছিল না। সোনিয়ার বান্ধবীরা বলত ঃ দূতাবাস নয়, আসলে ওটা হল ভূতাবাস। ওখানে যারা কাজ করে তারা সবাই হলো আস্ত ভূত। কাজকর্ম করে না, শুধু দপ্তরে বসে সিগ্রেট খায় কিংবা স্পাই থ্রীলার পড়ে। আর লণ্ডনের হাইকমিশনারের কর্মচারিদের দেখে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে যা রটে তা বটে। অর্থাৎ দূতাবাসের কর্মচারিগুলো ভূত না হলেও নিষ্কর্মার ঢেঁকি। অতএব ঐ অকর্মণ্য কোন সরকারী কর্মচারিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব শুনে তার মন বিদ্রোহ করে উঠলো। কিন্তু কী করবে সোনিয়া ভেবে পেল না। বাবা-মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মতো মনোবল তার

ছিল না। তাই সে মনে মনে ঠিক করল যে আজ রাত্রে সে ক্যাসিনোতে জুয়ো খেলবে মদ খাবে আর প্রয়োজন হলে নিষিদ্ধ সব কাজ করবে। আর জুয়ো খেলে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারলে সোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। একটা ভূত—সরকারি কর্মচারিকে বিয়ে করে তার পেত্নী হবার কোন ইচ্ছে নেই।

কিন্তু আজ বিধাতা তার ইচ্ছায় বাধা সাধলেন, কারণ রাত দশটা পর্যন্ত রুলেট টেবিলে প্রচুর অর্থ রোজগার করবার পর সাড়ে দশটার মধ্যে সোনিয়া হলো কপর্দকহীন। কী করবে সোনিয়া?

সোনিয়া গিয়ে বারে বসে একটি বিয়ারের অর্ডার দিল। বেশি দামি মদ খাবার পয়সাও তার আজ নেই।

পাশের টেবিলে আর একজন আরবের লোক বসে হুইস্কি খাচ্ছিল আর বারবার প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে সোনিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। লোকটি খুব সম্ভবত ইন্দোনেসিয়া কিংবা মরোক্কোর বাসিন্দা হবে। লোকটির হালচাল সোনিয়ার একেবারেই পছন্দসই হয়নি। বেশিক্ষণ লোকটির পাশের টেবিলে বসে থাকতে সোনিয়ার ভয় হলো। কী করবে সোনিয়া? রুলেট টেবিলে ফিরে যাবার আর্থিক সামর্থ্য তার নেই।

গুড ইভনিং মিস? কী ভাবছেন? সোনিয়ার চিন্তায় বাধা পড়ল। একজন অল্পবয়সী যুবক তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সানিয়া তাকিয়ে দেখল যে প্রশ্নকর্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটি কোন দেশের? ফরাসী কিংবা ইংরেজ নয়। হয়ত ইরানিয়ান হবে। সোনিয়ার এবার তার মাসীমার সতর্কবাণী মনে পড়ল। অপরিচিত লোক এসে যেচে আলাপ করবার চেষ্টা করবে, ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করবে··· তারপর···। এই তার পরের বহু কাহিনী সে গল্প উপন্যাসে পড়েছে।

বসতে পারি কি? দেখতেই পাচ্ছেন বারের কোথাও বসবার জায়গা নেই···।—ছেলেটি এবার সোনিয়ার জবাবের প্রতীক্ষা না করে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। সোনিয়া হয়ত আপত্তি করবার চেষ্টা করত···কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেল পাশের টেবিলের আরবের লোকটি ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর এই

দৃষ্টি যে যৌন আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত এই কথা সোনিয়ার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু অল্পবয়সী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সোনিয়ার মনে হলো যে প্রশ্নকর্তা ঐ আরব লোকটির মতো বাজে চরিত্রের লোক হবে না···

আপনি কে? আপনাকে আমি চিনি না? সোনিয়া মিষ্টি গলায় জবাব দেয়। আর জবাব দেবার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটির দিকে তাকায়। ছেলেটি প্রথম দৃষ্টিতে তার মনকে আকর্ষণ করেছে। কী সুন্দর টাই পরেছে? কালো লাউঞ্জ স্যুট···

আমাকে চিনবেন কী করে? আমিও রুলেট খেলে কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। তাই বেশ কিছু টাকা গচ্চা দিয়ে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করছি, আর আপনাকে দেখে···

ছেলেটি তার প্রশ্ন অসমাপ্ত রাখল। শুধু একবার জিজ্ঞেস করল: কত টাকা হারলেন? বাজি জিতলে নিশ্চয় এই বারের টেবিলে চুপ করে বসে থাকতেন না।

ছেলেটির প্রশ্ন যেন সোনিয়ার কানে রূঢ় শোনাল। মাসীমা বলেছিলেন, অপরিচিত লোক এসে তোর সঙ্গে যেচে আলাপ করবে। বিশেষ করে সোনিয়ার মতো সুন্দরী মেয়ে কি সহজে পাওয়া যায়? সত্যিই সোনিয়ার দেহ-সৌন্দর্য প্রলোভনীয়।

আমার প্রায় হাজার দশেক ফ্রাঙ্ক গচ্চা গেছে—বিয়ারের গ্লাসে ছোট চুমুক দিতে দিতে সোনিয়া জবাব দিল।

এবার ছেলেটি শিস দিয়ে উঠল। তার চোখে মুখে বিস্ময় উত্তেজনার ছাপ বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠল। বলল: দশ হাজার ফ্রাঙ্ক? অনেকগুলি টাকা।

কী করব বলুন? জিতেছিলাম, তারপরেই হারতে শুরু করলাম। এবার পুঁজি শেষ করে এই বারের টেবিলে বসেছি।

কোন দেশের মেয়ে আপনি? নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান?—ছেলেটি এবার মনের উত্তেজনাকে দমন করে ছোট প্রশ্ন করে।

শুধু ভারতীয়ই নই, বাঙালী। তবে লণ্ডনে থাকি। ইউনিভার্সিটির পড়াশুনা শেষ করেছি। এবার ডক্টরেট করব?

সোনিয়া সহজ গলায় জবাব দিল। তারপরেই জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কোন দেশের? নিশ্চয় ইরানিয়ান। আজকাল ইরানিয়ান বাসিন্দায় সমস্ত উইরোপ ছেয়ে গেছে।

ছেলেটি হাসল। সোনিয়ার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে অনুরোধের গলায় বলল ঃ আপনি বিয়ার খাচ্ছেন কেন? হুইস্কি চলে তো?

এবার সোনিয়া জবাব দিতে লজ্জা পেল। কী বলবে যে পয়সার অভাবে সে হুইস্কির অর্ডার দিতে পারেনি। কিন্তু অপরিচিত লোকের কাছ থেকে ডিনার কিংবা ড্রিংকস খাবার কোন অভিসন্ধি তার নেই। সোনিয়া উঠবার চেষ্টা করল। ছেলেটি তাকে বাধা দিল। বলল ঃ উঠছেন কেন? আমি আপনার টেবিলে এসে বসেছি বলে? ভয় নেই। আমি বাঘ-ভাল্লুক নই। আর স্পাই কিংবা স্মাগলার নই।

সোনিয়া লজ্জা পেল। বাধ্য হয়ে বসে পড়ল।

কী ড্রিংকসের অর্ডার দেব। হুইস্কি না শেরী? অবিশ্যি শ্যাম্পাইন অর্ডার দেবার মতো আমার সামর্থ নেই।

সোনিয়া চুপ করে রইল। ছেলেটি বয়কে ডেকে হুইস্কির অর্ডার দিল?

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে সোনিয়ার মনে হলো মাসীমা বলেছিলেন, নিষিদ্ধ জিনিস কিছু খেও না। আর নিষিদ্ধ জিনিস কী? হুইস্কি না, হাসিস? সোনিয়ার অনেক কলেজ বান্ধবী আজকাল আকচার পট খায়। কিন্তু সোনিয়া আজ অবধি হাসিস খায়নি। হুইস্কি খায়। সোনিয়ার মাসীমার সব বাধা নিষেধ অমান্য করবার ইচ্ছে আজ প্রবল হলো। বিশেষ করে এই সুন্দর ইরানিয়ান ছেলেটিকে দেখবার পর তার নিষিদ্ধ ইচ্ছে তীব্র হলো।

আপনার নাম কী?—ছেলেটি প্রশ্ন করে।

সোনিয়া রায়। আপনার? দাঁড়ান, আমি আপনার নাম বলছি…

অপনি বুঝি লোকের চোখ মুখ দেখে তাদের নাম চরিত্র বলতে পারেন?

কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। হ্যাঁ আপনার নাম কী 'হারমিট'?

হারমিট? আচ্ছা আমার এই নাম আপনার মনে হলো কী করে? — ছেলেটি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

দেখুন এই রুলেট খেলতে কোন হারমিট কিংবা ভগবান যীশু আসেন না। তাই আপনাকে হারমিট নাম ধরে ডাকলাম। বেশ 'হারমিট' নামটি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনাকে 'অমিট' বলে ডাকব। আপত্তি করবেন না তো?—সোনিয়া এই প্রশ্ন করে অমিটের মুখের পানে তাকাল।

আপনি আমাকে 'অমিট' বলে ডাকবেন এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।—অমিট জবাব দিল। তারপরেই আচমকা প্রশ্ন করল: ডিনার খেয়েছেন? আপনার শুকনো মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি এখনও কিছু খাননি। চলুন এই ড্রিংকসের পর আমরা ডিনার খাব। আপত্তি আছে?

সর্বনাশ! তাহলে মাসীমা ভুল বলেননি? প্রথমে ড্রিংকস, তারপরে ডিনার এবং সর্বশেষে বিছানা। সোনিয়ার একবার মনে হলো যে সে একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানের হাতে পড়েছে। শয়তান সুন্দর মুখ নিয়ে তার সর্বনাশ করতে এসেছে।

আর সর্বনাশ মানে কী? সতীত্ব হারাবে? সোনিয়া তার ভারতীয় বান্ধবীদের কাছে শুনেছে যে 'ভারতীয় বাবুরা' বিদেশে এসে এনতার প্রেম করবে, বিদেশী মেয়েদের 'নিসট্রেস' করে রাখবে। পুরুষদের 'সতীত্ব' যাচাই করবার তো কোন উপায় নেই। মেয়েদের বেলাই যত হাঙ্গামা। আর ঐ সব 'বাবুরা' দেশে ফিরে গিয়ে বলবে আমার সতীলক্ষ্মী গৃহস্থ বউ চাই। আর পণ বাবদ এক লাখ থেকে দশ লাখ অবধি···।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সোনিয়ার মনে এই ধরনের হাজার কথা এসে জড়ো হলো। কী করবে সে? আপত্তি করবে? কিন্তু অমিটের সুন্দর মুখের পানে তাকিয়ে আপত্তি করবার ইচ্ছা হল না। কিন্তু সোনিয়ার মনে হল ডিনার শেষে অমিট যদি তাকে বলে চলুন আজ রাত্রে আপনি আমার বাড়িতে রাত কাটাবেন? এই কথার কী জবাব দেবে? সোনিয়া কি আপত্তি করতে সাহস বা মনোবল পাবে?

আজ লণ্ডনের পাব্লিক স্কুলের মেয়ে, সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সোনীয়া যেন নিজেকে নিতান্তই দুর্বল, অসহায় বলে মনে করল। সোনিয়া ভাবল যদি শেষ পর্যন্ত অমিট তাকে শয্যাসঙ্গিনী করে এবং সোনিয়া তার কৌমার্য হারায় তাহলে সে কি করবে? হঠাৎ সোনিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতায় বিয়ে বাড়ির দৃশ্য। সোনিয়া সেজেগুজে 'ভূতাবাসের' সেই অপদার্থ কর্মচারির জন্যে বসে আছে। তারপর বিয়ের প্রথম রাত্রে বর যদি জানতে পারে সোনিয়ার এই অতীত ইতিহাস? তাহলে কী হবে? না, সোনিয়া ডিনার খাবে না? এক্ষুনি অমিটকে বলবে: না, না আমার খিদে নেই, ডিনার খাব না···। কিন্তু হুইস্কির তীব্র নেশা, আর মনের দুর্বলতা সে কাটাতে পারল না।

অমিট তাকে নিয়ে ডাইনিংরুমে গেল। তারপর সোনিয়ার হাতে মেনু কার্ড তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল: কী খাবেন বলুন? চিকেন, না অন্য কোন কিছু? বীফস্টিক পাবেন, তবে আমেরিকান বীফস্টিকের মতো নয়। আর মাংসের সঙ্গে উৎকৃষ্ট 'রেড ওয়াইন' নিতে পারেন।

সোনিয়া চিকেনের অর্ডার দিল। তবে বলল, আমার 'রেড ওয়াইন' খাবার ইচ্ছে নেই।

মিস সোনিয়া আপনি রেড ওয়াইন খেতে আপত্তি করবেন না। জীবন উপভোগ করতে এই মণ্টিকার্লোর কাসিনোতে এসেছেন। জীবনের মিষ্টি স্বাদ একটু চেখে দেখুন। আবার কবে এই আন-ম্যারেড জীবন উপভোগ করবেন কে জানে?—অমিট বেশ অনুরোধ করেই এই কথাগুলি বলল।

আমি যে আনম্যারেড কিংবা ভবিষ্যতে আনম্যারেড থাকব না, এই কথা আপনাকে কে বলল?

কেউ বলেনি, তবে আপনার চোখ মুখ দেখে বেশ উত্তেজনা, মনের চঞ্চলতার আভাস পাচ্ছি···বলুন, আমি সত্যি বলেছি কিনা? —অমিট এবার জোর গলায় বলল: আপনার মতো অমন সুন্দরী মেয়ে কি আর বেশিদিন গৃহলক্ষ্মী না হয়ে থাকতে পারে?

বয় এসে ডিনারের অর্ডার নিয়ে গেল। অমিট বেশ অনর্গল

ফরাসী ভাষায় অর্ডার দিল। সোনিয়া অমিটের মুখে ফরাসী ভাষা শুনে অবাক হয়েছিল।

আপনি তো চমৎকার ফরাসী ভাষা বলেন? আর অন্য কোন ভাষা জানেন? সোনিয়া প্রশ্ন করে।

কিছু কিছু জার্মান, স্প্যানিশ, আরবী, ইতালিয়ান বলি। আর আপনি কি ফরাসী ভাষা বলেন?

অমিটের মুখে অনেক বিদেশী ভাষার নাম শুনে সোনিয়া আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নিজের ভাষার পারদর্শিতার কথা বলতে গিয়ে একটু থেমে বলল: কাজ চালাবার মত ফরাসী বলতে পারি। তবে আমার ফরাসী ভাষা বাঙালীর হিন্দী ভাষার মতো।

বেশ এবার আপনার বিয়ের কথা বলুন?—অমিট কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করল।—বিয়ে কবে করছেন?

আপনি কি সবজান্তা নাকি? এতগুলি ভাষা বলছেন, আর জ্যোতিষীবিদ্যা জানা আছে নাকি?—সোনিয়া জবাব দিল।

অমিট অপরিচিত, তার কাছে কি মনের কথা খুলে বলবে? ভাবল সোনিয়া।

না, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

আচ্ছা, আমার বিয়ে সম্বন্ধে আপনার এত কৌতূহল কেন? সোনিয়ার মনে হলো যে তার মনোবল ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে।

কারণ অতি সহজ। আমি আপনার বিয়ের তারিখ কবে সেইটে জানতে চাই···অমিট ছাড়বার পাত্র নয়। তার কণ্ঠস্বর শুনে এই কথা স্পষ্ট বোঝা গেল।

সোনিয়া হাল ছেড়ে দিল। বুঝতে পারল আজ সহজে অমিটের হাত থেকে রেহাই পাবে না, আর অমিট যখন বাঙালী ছেলে নয়—তখন তার কাছে মনের কথা খুলে বলতে আপত্তি কী?

সোনীয়া বলতে লাগল: আমার বাবা কলকাতায় এক বড় কমার্শিয়াল ফার্মের চেয়ারম্যান। আমার আরও একটি ভাই আছে। আই আই টিতে পড়ছে। আমি বড়। স্কুল কলেজ দুটোই লণ্ডনে পড়েছি। ভেবেছিলাম কিছুদিন স্বাধীনভাবে কাজ করব, কিন্তু বাবা ছাড়বার পাত্র নয়। আমার মাসীমাকে বলে দিয়েছেন যেন

আমাকে সঙ্গে করে দেশে ফেরৎ নিয়ে যান। বাবা আগামী মাসে আমার বিয়ের দিন ঠিক করেছেন। আর পাত্রকে আমি আজ পর্যন্ত চোখে দেখিনি।

ছেলেটি কী করে?—অমিট জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

কী আর করবে? সরকারি চাকরি, দূতাবাসে কাজ করে। আমি তো ভাবতেই পারছিনে যে ফরেইন সার্ভিসের কোন কর্মচারির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। যে লোককে আমি চোখে দেখিনি কিংবা যার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তাকে বিয়ে করা কি সম্ভব? আর দূতাবাসের চাকরি আমি অপছন্দ করি। ছেলেটির নাম হলো অরুণ মিত্র।—সোনিয়া একটানা জবাব দিয়ে একটু ক্লান্তি অনুভব করল।

কেন, দূতাবাসের কর্মচারিদের প্রতি আপনার এত অনীহা কেন?—অমিট জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

আপনার দূতাবাসের লোকদের সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। ওরা হলো নিষ্কর্মার ঢেঁকি। আর জানেন তো ওদের জীবন হলো উচ্ছৃংখল। সদা সর্বদাই অ্যাম্বাসাডারের বউ-এর পেছু পেছু ঘুরতে হয়। আমি ওসব কাজ করতে পারব না। আর শুনেছি ফরেইন সার্ভিসের লোকেরা প্রায়ই ডিভোর্স করে। বলুন তো বিয়ে করে যদি ছাড়াছাড়িই হয়ে যায়, তাহলে বিয়ে করার কী দরকার?

আমার মনে হয় আপনি অনর্থক চিন্তা করছেন। অবশ্য বিয়ের আগে অহেতুক চিন্তা করা স্বাভাবিক, তবে দেখবেন বিয়ের পর আর কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না।

ডিনার প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সোনিয়ার মনে ভয় করতে লাগল এবার অমিট কী প্রস্তাব করবে? অতি গতানুগতিক প্রস্তাব, সাধারণত নাইট ক্লাব কাসিনোতে মেয়েদের কাছে ছেলেরা যে কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব করে। বলবে: আজ রাত্রীটা তুমি আমার সঙ্গে কাটাও। সোনিয়া এই ধরনের বহু কাহিনী উপন্যাসে পড়েছে।

অমিট কিছুক্ষণ সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল: এবার কী করবেন। বাড়ি যাবেন?

বেশ শঙ্কিত হয়ে সোনিয়া বলল: না, না এত তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। কী হবে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে। যাবেন কোথায়, নীসে? আমার গাড়ি আছে, আমি আপনাকে হোটেলে পেঁাছে দেব। বরং আসুন আবার ভাগ্য পরীক্ষা করি?

সোনিয়া যেন অমিটের কথা বুঝতে পারল না। কী বলছেন? বিস্মিত গলায় সোনিয়া প্রশ্ন করল।

অতি সহজ, সরল প্রস্তাব। চলুন আবার রুলেট টেবিলে ফিরে যাই। রাত একটা। খেলার আসর বেশ জমজমাট হয়েছে—অমিট নাছোড়বান্দা, সোনিয়াকে রুলেট টেবিলে নিয়ে যাবেই। অথচ সোনিয়া বলতে পারে না যে তার ব্যাগে রুলেট খেলবার মতো পয়সা নেই।

জানি আপনি কী ভাবছেন? আপনার হাতে পয়সা নেই। আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি। পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক। একটা প্রবাদ আছে যে ধারের পয়সায় বাজি খেললে জেতা যায়।

ধরুন যদি আমি হেরে যাই তাহলে আপনার পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক কী হবে?—সোনিয়া বেশ ইতস্তত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

ভাববার কিছু নেই, যদি হারেন তবে ধরে নেবেন যে এ টাকাটা হলো আপনার বিয়ের প্রেজেণ্ট। আর যদি জেতেন তাহলে আমরা লাভের অংশ ভাগ করে নেব।—অমিট বেশ সহজ গলায় জবাব দিল।

এর পর আর টাকা ধার নিতে আপত্তি করা যায় না। মনে সঙ্কোচ থাকা সত্ত্বেও সোনিয়া অমিটের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার নিল। তারপরে দুজনে রুলেটের টেবিলে গেল।

জুয়ো খেলার তীব্র নেশা। আর ক্রুপিয়েরের চিৎকার শুনে এবং রুলেটের কাঁটা ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়ার মনের উত্তেজনা বাড়ল। আধঘণ্টার মধ্যে সোনিয়া প্রায় এক লাখ ফ্রাঙ্ক জিতল। এক লাখ ফ্রাঙ্ক! সোনিয়া সত্যিই কল্পনা করতে পারেনি যে অমনি ভাবে তার ভাগ্যচক্র ঘুরে যাবে। অবশ্যি অমিট সব টাকাই তার পকেটে রেখে দিয়েছিল। কাসিনোর বাইরে গিয়ে টাকা ভাগ করা যাবে।

সোনিয়া তার ওভারকোট আনতে চলে গেল। হয়ত রুলেটের ঘর থেকে প্রায় পাঁচ মিনিটের জন্য সে বাইরে গিয়েছিল। কোট নিয়ে ফিরে এসে দেখল অমিট নেই।

অসম্ভব। সোনিয়া বিশ্বাস করতে পারল না যে অমিট তাকে ফেলে চলে গেছে।

কোথায় গেল অমিট। সানিয়া রুলেটের ঘরের চারদিকে অমিটের খোঁজ করল। তারপর কাসিনোর উপর নিচ দু-চারবার ঘুরে দেখল। কিন্তু কোথাও অমিটের দেখা নেই। সোনিয়া যখন মনে করল যে অমিটের কাছে তার এক লাখ ফ্রাঙ্ক গচ্ছিত আছে তখন তার মনে প্রথমে উত্তেজনা, পরে ক্ষোভ হতে লাগল। মাসীমা ঠিক কথাই বলেছিলেন, কাসিনোর কোনো অপরিচিতকে কক্ষনো বিশ্বাস করতে নেই। এখন সে কী করবে? সোনিয়া তার ব্যাগ খুলে দেখল যে নীসে যাবার জন্য তার মাত্র একশ ফ্রাঙ্ক আছে।

সোনিয়া এবার কাসিনোর ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে তার দুর্দশার কথা বলল। ডিরেক্টর একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সোনিয়ার দিকে তাকালেন। তারপর বললেনঃ মিস আমি দুঃখিত। একজন অপরিচিতকে অতগুলি টাকা দিয়ে বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে একেবারেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি। আজকাল এই ধরনের ধোঁকাবাজ কাসিনোতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। যাক দেখি আমি কী করতে পারি।

ডিরেক্টর এবং কাসিনোর অন্যান্য কর্মচারিরা বিশেষ করে প্রহরী বিভাগ অমিটের সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাল। কিন্তু কোথায় অমিট?

রাত তিনটের পর সবাই নিরাশ হয়ে অনুসন্ধানের কাজ ছেড়ে দিল। ডিরেক্টর এবার তার গাড়ি এবং শোফার সোনিয়াকে দিলেন। বললেন এত রাত্রে আপনি ট্যুরিস্ট বাস পাবেন না। আমার গাড়ি আপনাকে নীসের হোটেলে পেঁাছে দেবে।

দুদিন পরে সোনিয়া এবং তার মাসী লণ্ডনে ফিরে এলো। বাকি দুটি দিন সোনিয়া আর কোথাও বেরোয়নি। হোটেলেই বসে ছিল।

লণ্ডনে ফিরে এসে তার বার বার অমিটের কথাই মনে হতে লাগল। অমিট যে তাকে ধোঁকা দিয়ে অতগুলি টাকা নিয়ে যাবে এই কথা সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

লণ্ডনে এসে সোনিয়া তার বাবার চিঠি পেল। বাবা লিখছেন, আগামী মাসের সতের তারিখে তার বিয়ে।

এবার সোনিয়া ঠিক করল যে তার বাবার নির্দেশ অমান্য করবে না। হাজার হোক দূতাবাসের কর্মচারি অমিটের মতো এত অসভ্য ইতর লোক হবে না। আর তার ভাগ্যে যখন বিয়ে লেখা আছে তখন সে বিয়েই করবে।

বোম্বাই-এর পথে রওনা হবার দুদিন আগে মাসী তাকে ডাকলেন। বললেন, বাইরের ঘরে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আর হঠাৎ এই কথা শুনে সোনিয়ার বুক কাঁপতে লাগল এই অপরিচিত লোকটি কে? আর অপরিচিত লোকটি কী করে তার ঠিকানা যোগাড় করল? হয়ত দূতাবাসের নিষ্কর্মা কর্মচারি তাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সোনিয়া অবাক হলো, অমিট! ঘরের ভেতর অমিটকে দেখতে পাবে আশা করেনি। অমিট তার লণ্ডনের ঠিকানা পেল কোত্থেকে? অমিটকে দেখে রাগে তার শরীর জ্বলতে লাগল। অসভ্য, ইতর, বদমাশ। সোনিয়ার টাকা চুরি করে আজ কোন মুখ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?

আমাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। নীসে আপনার অনেক অনুসন্ধান করেছিলাম। কিন্তু নীসের হোটেলের মালিক বলল যে আপনি এবং আপনার মাসীমা লণ্ডনে চলে গেছেন। আর ওদের কাছে আপনার লণ্ডনের ঠিকানা পেলাম। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আপনার কাসিনোর রুলেটের জেতা টাকা তো আমার কাছে আছে।—অমিট কথাগুলি বলে হাসতে লাগল। তার কণ্ঠস্বরে কোন অনুতাপের সুর ছিল না। সোনিয়া অমিটের স্পর্ধা দেখে অবাক হলো।

আপনি যে এত বড় জোচ্চোর আমি জানতাম না—সোনিয়া তার রাগ চাপতে পারল না।—সেদিন রাত্রে আপনি টাকা নিয়ে কোথায়

পালিয়ে গেলেন ? সত্যি সব টাকা নেয়া যদি আপনার ইচ্ছে থাকে তাহলে বললেই তো পারতেন। আর আজ টাকা ফেরৎ দিতে এলেনই বা কেন ?

কারণ টাকাটা আপনার, আমার নয়। আমার কাছে ঐ টাকা শুধু গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। এবার টাকা ফেরৎ দেবার সময় হয়েছে। তাই ঠিকানা বের করে লণ্ডনে আপনার হোটেলে চলে এলাম।—অমিট জবাব দিল। তারপর আবার বলতে শুরু করল ঃ টাকাটা নিয়ে হঠাৎ চলে আসবার কারণ ছিল। কারণ সেই রাত্রে আপনার হাতে টাকা থাকলে আপনার আবার রুলেট খেলবার লোভ হতো। আপনি নিশ্চয় হারতেন।

আপনার এই মিষ্টি কথার জন্যে ধন্যবাদ। আপনি যে এমন অসভ্য প্রকৃতির লোক হবেন আমি আগেই জানতাম।

কী করে ? অমিট কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

কারণ আপনি বিদেশী ইরানিয়ান। শুনেছি আজকাল ইরানের লোকগুলি বিদেশীদের ঠকিয়ে টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করছে ···সোনিয়ার কণ্ঠস্বর ক্রমেই কর্কশ হতে থাকে।

অমিট এবার টাকার ব্যাগ সোনিয়ার হাতে তুলে দিল। তারপর বেশ মৃদুকণ্ঠে বলল ঃ আমি ইরানিয়ান নই।

আপনি ইরানিয়ান নন ? তাহলে আপনি কোন দেশের ? আমি আপনার মিষ্টি গলা শুনে আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি নিশ্চয় ঠগ জোচ্চোর—উত্তেজিত হয়ে বেশ হাঁপাতে-হাঁপাতে সোনিয়া বলল।

যদি বলি ভারতীয় তাহলে বিশ্বাস করবেন কি ?

প্রথমে সোনিয়া বিশ্বাস করতে চাইল না যে অমিট ভারতীয়। আর সত্যিই সেদিন যদি সে জানতে পারত অমিট ভারতীয়, তাহলে হয়ত সোনিয়া অমিটের ফাঁদে পা দিত না।

না বিশ্বাস করব না, কারণ আমি জানি যে আপনি কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আবার আমার কাছে এসেছেন। এবার বলুন তো আপনার আসল উদ্দেশ্য কী ?—সোনিয়া তার মনের রাগ চাপতে পারল না। বেশ ধমকের গলায় শেষে কথাগুলি বলল।

দেখুন, আপনি রাগ করবেন না—অমিট তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। আমি নিজের ইচ্ছায় যেচে আপনার টাকাগুলি ফেরৎ দিতে এলাম। আর আপনি মিষ্টি কথায় ধন্যবাদ দেবার পরিবর্তে আমাকে গালমন্দ করছেন। আমি যে ইরানিয়ান এই বিশ্বাস আপনার হলো কী করে? যাক, আমি তো আমার নিজের পরিচয় আপনাকে দিইনি। এবার এই টাকাগুলি তুলে রাখুন। অনেকগুলি টাকা। আপনার বিয়ের শাড়ি, গয়না কিনবার জন্যে দরকার হবে।—অমিট এবার টাকার প্যাকেট সোনিয়ার হাতে তুলে দিল।

আমি যে ঐ ছেলেকে বিয়ে করব এই কথা আপনাকে কে বলল? আমি পাত্রকে চোখে দেখিনি।—সোনিয়ার গলার সুর নরম হয়ে এল। তার বিয়ের কথা যে পাকা হয়ে গেছে এই কথা অমিট জানল কী করে?

আপনার মাসীমা বললেন যে সেই নিষ্কর্মা দূতাবাসের কর্মচারি আপনাকে পছন্দ করেছে।—অমিট জবাবদিহির সুরে বলল।

ওঃ আপনি বুঝি সবজান্তা। যাক আপনার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করব না। আর টাকা ফেরৎ দেবার জন্যে ধন্যবাদ। নমস্কার, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার আর কোন চেষ্টা করবেন না। এই আমাদের শেষ দেখা···

অমিট হাসল। তারপর মৃদু মিষ্টি গলায় বলল ঃ সত্যি রাগ করলে আপনাকে আরও সুন্দরী দেখায়। আর শুনুন, আজকাল পাত্র-পাত্রী দেখবার, আলাপ পরিচয় করবার নিয়ম কানুন পাল্টেছে। আগে পাত্র কনেকে তার বাপের বাড়িতে দেখত। আজকাল তাদের দেখাশোনা, সাক্ষাৎ করবার স্থান হল রেস্তোরাঁয়, নাইট ক্লাবে এবং কাসিনো···

তারপর ঘরের বাইরে যাবার আগে বলল ঃ অবশ্য এই আমাদের শেষ দেখা নয়। বিয়ের আসরে আবার দেখা হবে। সেদিন শুভদৃষ্টির সময় রাগ করে চোখ মুখ বুজে থাকবেন না। হাসবেন ···আর এই রইল আমার কার্ড। আমি হলাম অরুণ মিত্র, প্যারীর ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর সেকেণ্ড সেক্রেটারি।

বিচার

গাঁয়ের নাম রায়পুর। মধ্যপ্রদেশের ছোট একটি গ্রাম। মেল ট্রেনগুলি সাধারণত এই ছোট স্টেশনে থামে না। হুস করে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু রায়পুর এককালে ছোট গ্রাম ছিল না। সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল, বড় বড় স্কুল ছিল, হাসপাতাল ছিল। এছাড়া বড় পুজোর মণ্ডপ ছিল, যেখানে সন্ধ্যা হলেই নহবৎ বাজত। মন্দিরের পুরোহিত দীর্ঘকালের। তিনি এই গ্রামের উত্থান-পতন সব দেখেছেন। তখন এ গ্রামে গোলাভর্তি শস্য ছিল, ছোট একটা ফ্যাক্টরি ছিল। লোকের মনে সুখ দুঃখ ছিল। এলাকার সবাই এক ডাকে রায়পুর গ্রামকে চিনত।

তারপরেই সব শহরের রূপ এবং রং পাল্টে গেল। গ্রামের ঐশ্বর্য গেল, আর সেই সঙ্গে রায়পুর শ্রীহীন হল। স্কুলগুলি টিম টিম করে চলছে। একটা কলেজ ছিল কিন্তু কয়েক বছর আগে ঐ কলেজও উঠে গেছে।

তারপর হাসপাতাল।

বড় হাসপাতাল। বড় বড় ডাক্তারেরা এই হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সকাল বিকেল রুগীতে গিস গিস করত। এই শহরের রং এবং রূপে পাল্টে গেল, যেদিন গ্রামের জমিদার বেণীমাধববাবু মারা গেলেন। বেণীমাধব জানতেন কী করে গ্রামের শ্রী বৃদ্ধি করতে হয়, ব্যবসার সমৃদ্ধি করতে হয়। তার শাসনকালে স্কুলে এবং কলেজে নিয়মিতপড়াশুনা হত এবং বহুবার তার স্কুলের ছাত্রেরা জলপানি পেয়েছে।

ঐ সময়ে মেল ট্রেনগুলি রায়পুর স্টেশনে থামত। সাহেবরা ট্রেন থেকে নামতেন। স্টেশন মাস্টার তাদের অভ্যর্থনা করতে ছুটে

চলে আসতেন।

কিন্তু আজকাল রায়পুর গ্রাম হয়েছে শ্রীহীন। শহরকে দেখলে মনে হবে দু'তিনটে দুর্ভিক্ষ কিংবা ঝড় গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। ভাঙা রাস্তাঘাট, লোকজনদের জীর্ণবাস। কয়েকটা গরুর গাড়ি ক্যাচ-ক্যাচ করে বয়ে চলেছে।

এই পরিবর্তন হল কেন।

আগের জমিদার বেণীমাধব রায়পুরকে বড় করবার জন্যে পয়সা খরচ করতেন, হাসপাতালের জন্যে বড় বড় ডাক্তার নিয়ে আসতেন। স্কুলের জন্যে উচ্চশিক্ষিত মাস্টার দেন। রাস্তাঘাট পাকা ছিল।

আজকাল গ্রামের নতুন জমিদার হয়েছেন নীলমাধব। বেণীমাধবের ছেলে। গ্রাম বড় হোক বা না হোক সেদিকে তার দ্রুক্ষেপ ছিল না। কোষাগারের টাকা আর গ্রামের উন্নতির জন্যে ব্যয় করা হত না। সেই টাকা ব্যয় করা হত জমিদারের স্তাবকদের জন্যে, বাঈজীর জন্যে···এবং রাত্রের বন্য শিকার ধরবার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে কলেক্টর এলে তাকে প্রচুর খাওয়ানো হত, বাঈজীর নাচ হত। এইসব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নীলমাধব সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট দিতেন। সাহেব খুশি থাকলে সরকার খুশি। অতএব জমিদার নীলমাধবকে কোনদিন সরকার কিংবা পুলিশ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয়নি।

কিছুদিন আগে গ্রামে হৈ-হল্লা শুরু হয়েছে। গ্রামে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে। এই পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট অনুতোষ ছিলেন নীলমাধবের অতি অনুগত। এবারও পঞ্চায়েতের জন্যে আবার প্রার্থী হবেন অনুতোষ। বাজারে গুজব অনুতোষ প্রতি সকালে জমিদারের জুতো পালিশ করে দেন। শুধু তাই নয়, বাজারের আর আর একটি অলিখিত গুজব হল, অনুতোষ দালাল। জমিদার নীলমাধবের জন্যে নিত্যি নতুন মেয়ে সংগ্রহ করে দেন। তাই সবাই জানে যে এই আসন্ন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে অনুতোষের জয় সুনিশ্চিত।

কিন্তু হঠাৎ গ্রামের আবহাওয়া পাল্টে গেল। শোনা গেল এবার এই গ্রামে মালতী নামে একটি অপূর্ব সুন্দরী মহিলা আসছেন। ধনী এবং একদিন কোন এক বিস্মৃতকালে মালতী এই

গ্রামেরই মেয়ে ছিল। তবে আজ পর্যন্ত কেউ সঠিক বলতে পারেনি মালতী কেন হঠাৎ নির্বাচনের সময় রায়পুর গ্রামে আসছেন। বাজারে আরও দু'চারটে গুজব রটেছে। একটি গুজব হল মালতীদেবী অগাধ টাকার মালিক। তার সম্পত্তি ও গচ্ছিত টাকার লেখাজোকা নেই।

দ্বিতীয় গুজব হল যে তিনি এবার অনুতোষের বিরুদ্ধে এক ক্যান্ডিডেট দাঁড় করাবেন। টাকা দিয়ে তিনি ভোট কিনে নেবেন। এইখানেই মালতীদেবীর শক্তি। কারণ গ্রামের জমিদার নীলমাধব এবং অনুতোষের টাকা নেই। বরং বাজারে তাদের দুর্নাম আছে।

সেদিন বাঈজীর নাচ হবার পর বেশ মাতাল অবস্থায় জমিদার নীলমাধব তার মোসাহেব অনুতোষকে জিজ্ঞেস করলেন হ্যারে, শুনলাম এবার রায়পুরের নির্বাচনে এক সুন্দরী ধনী মহিলা যোগ দিচ্ছেন···

অনুতোষ মৃদু আপত্তির সুর তুলে বলল, না উনি যোগ দেবেন না। তবে হয়তো কাউকে এই নির্বাচনে দাঁড় করাবেন। তুই কী বলছিস? তোর আর আমার বিরুদ্ধে। সাহস তো কম নয়? নীলমাধব এবার গ্লাসে আর একটু সুরা ভরলেন। বললেন অনুতোষ ব্যাপারটি জমে উঠছে। তা উনি কবে আসছেন? নীলমাধবের গলার স্বর জড়িয়ে গেল।

শুনেছি আজ বিকেলে, উনি বোম্বাই মেলে রায়পুর এসে পোঁছুবেন। গ্রামের সবাই তো ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। অনুতোষ বলল।

বোম্বাই মেলে? বলিস কীরে অনুতোষ? এই স্টেশনে তো বোম্বাই মেল থামে না।

কিন্তু আজ থামবে। শুনেছি রেলওয়ে কোম্পানিকে প্রচুর টাকা দিচ্ছেন। টাকা পেলে ওরা সব করতে পারে অনুতোষ জবাব দিল।

এবার জমিদার নীলমাধব তার হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন শোন অনুতোষ, এই রায়পুর গ্রামে টাকা ঢেলে ভোট কেনা যাবে না। সবই নির্ভর করছে ক্যান্ডিডেট এবং আমার জনপ্রিয়তার উপর।

তারপর নীলমাধব বললেন, তুই কী বললি, সুন্দরী, ভদ্রমহিলা এবং আমার সমবয়সী। দেখি আমার সঙ্গে পাল্লা দেয় কী করে? পারবে না, পারবে না। একবার আমি ওকে ধরে নিই, তাহলে ওকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেব যে আমার জনপ্রিয়তা ওর টাকার চাইতে অনেক শক্তিশালী। যাক আজ তোর তো স্টেশনের কাছেই বক্তৃতা দেবার কথা।

চমৎকার। এমন সময় যদি বোম্বাই মেল এসে পেঁছয় তখন সবাই কী দেখবে জানিস? হাজার হাজার লোক তোর সভায় যোগ দিয়েছে…

* * *

বিকেল পাঁচটার সময় জরাজীর্ণ রায়পুর স্টেশনে বেল বাজল। একটু বাদে বোম্বাই মেল আসবে। স্টেশন মাস্টার সেই পুরানো ড্রেস পরে স্টেশনে হাজির হলেন বোম্বাই মেল আজ 'রায়পুর' স্টেশনে থামবে। একী চাট্টিখানি কথা। অনেকদিন আগে এখানে বড় বড় ট্রেন থামত, বড় মানুষ ব্যবসায়ী নামতেন, কুলীর হাঁকডাক ছিল, এবং এক কথায় বলা যায় স্টেশন সরগম হয়ে উঠত।

আজ বোম্বাই মেল আবার রায়পুরে থামছে। যাত্রীর কোন হৈ-হল্লা নেই। সবই যেন নিঃঝুম, নিঃশব্দ। তাই স্টেশন মাস্টার এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছেন। তিনি জানতে চান তার এই ভি-আই-পি যাত্রীটি কে? তিনি খবর পেয়েছেন যাত্রী ভদ্রমহিলা। বয়স কত?

স্টেশনের প্রাশে হচ্ছে এক বিরাট জনসভা। স্থানীয় ইলেকসনের মিটিং। বক্তা ও প্রার্থী অনুতোষ।

অনুতোষ! স্টেশন মাস্টার মনে মনে হাসলেন। সেদিনকার অনুতোষ, অল্পবয়সী আজ সে হয়েছে জমিদার নীলমাধবের চাটুকদার, অনুগ্রাহী। অনুতোষের কী কাজ করার ক্ষমতা নেই। নইলে সে কেন লম্পটের মোসাহেব হবে।

দেয়ালের চারদিকে লেখা আছে: ভোট ফর অনুতোষ!

বিকেল ছটা থেকে নির্বাচনী সভা। স্টেশন মাস্টার ভেবেছিলেন যে বোম্বাই মেল চলে যাবার পর তিনি নির্বাচনী সভায় যোগ

দেবেন। চোর অনুতোষ! আজ প্রায় দশবছর যাবৎ অনুতোষ এই স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু কী উন্নতি হয়েছে। এতবড় গ্রাম ছিল, ধান ধান্য ভরা ছিল মাঠ, কিছুর তো অভাব ছিল না! স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ছিল। রাস্তাঘাট ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে নীলমাধব গ্রামের জমিদার হলেন, এবং অনুতোষ তার মোসাহেব পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান হলেন সেদিন থেকে গ্রামের শ্রী'র পরিবর্তন হল।

নীলমাধব এক দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ছিল। লোকে বলে গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরেই সে হানা দিয়েছে। কাঞ্চনের জন্যে নয়, কামিনীর জন্যে। তিনি অনেকটা আরব্য রজনীর মত। প্রতি রাত্রে তার একটি নতুন মেয়ের দরকার হত। আর অনুতোষ এই সব মেয়েদের সংগ্রহ করে এনে দিত। গ্রামের পুরুষদের পুরুষ না বলাই উচিত হবে। যেকোন প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করত পরদিন তার মৃত লাস রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যেত। পুলিশ এবং ডাক্তার সার্টিফিকেট দিতেন, অপঘাতে খুব সম্ভবত সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

স্টেশন মাস্টার দীর্ঘকাল এই রায়পুর এলাকায় বসবাস করছেন। অতএব গ্রামের হালচাল, নীলমাধব এবং অনুতোষের চরিত্র বেশ ভাল করেই জানা আছে। তিনি মনে মনেই হাসলেন। এই শয়তানদের বিরুদ্ধে কোন মহিলা কী লড়াই করে পারবে? তিনি মনে করুন না···

একটু বাদে দূর থেকে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল।

যারা কৌতুহলী হয়ে বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন তারা দৌড়ে ছুটে স্টেশনে গেলেন। শুধু একজন নয়, দুজন নয়, প্রায় হাজার খানেক লোক। সবাই ভুল করেছিল।

প্রথম ট্রেন ছিল মালগাড়ি। গাড়িটি ধুঁয়ো দিয়ে স্টেশন দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। সবার মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল।

একটু বাদে রায়পুর গ্রামের এক রিসেপশন কমিটি এসে স্টেশনে হাজির হল।

কী ব্যাপার? স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন।

মাস্টারমশায় আপনি শোনেননি বুঝি। আজ যিনি আসছেন

তিনি এই গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু মহিলা। শুনেছি এই গ্রামের উন্নতির জন্যে তিনি অনেক টাকা খরচ করবেন···হাসলেন স্টেশন মাস্টার।

আমরা তাকেই অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি।

এ ভদ্রমহিলা গ্রামের জন্যে খরচ করবেন না, নীলমাধববাবুর জন্যে? স্টেশন মাস্টার গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন। শোনেন মশায়, স্টেশন মাস্টার গলার স্বর আরো নিচু করে বললেন, এই গ্রাম মানে নীলমাধব এবং তার মোসাহেবদের দল। আপনারাই বলুন, আজ অবধি নীলমাধববাবু গ্রামের জন্যে কী করেছেন। কিছুই না। রাস্তাঘাট ভাঙা, স্কুল কলেজ প্রায় বন্ধ, হাসপাতালে ডাক্তার আছে, কিন্তু ওষুধ নেই। সরকার প্রতিবছর গ্রামের জন্যে অনুদান দেয় সবই যায় ঐ নীলমাধবের জঠরের জন্যে কিংবা তার মোসাহেবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মিটিং শুরু হবার আগেই ট্রেন এল। জনসভার লোকগুলি দৌড়ে ছুটে এল। স্টেশন মাস্টার এলেন। তিনি এয়ারকণ্ডিশনড কোচের কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটু বাদে দরজা খুলে এক সুন্দরী মহিলা বেরিয়ে এলেন। মহিলা বটে তবে বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি নয়। তবে তার সুন্দর চোখ মুখের গড়ন, দেহের গঠন সবকিছু মানুষকে আকর্ষণ করবার মত। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখের হাসি ছিল সবচাইতে আকর্ষণীয়।

রানীমা কী জয়! উপস্থিত জনতার মধ্যে অনেকে চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ কী করে মালতী রানীমা হল তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। উপস্থিত মিটিং তখনও শুরু হয়নি। তাই অনুতোষ এসে জনতার মধ্যে দাঁড়াল। তিনি 'রানীমা' অর্থাৎ মালতীর মুখের দিকে তাকালেন। তার চোখে ছিল সানগ্লাস।

রানীমা, অনুতোষের মুখ দিয়ে অস্ফুট ধ্বনিতে এই কথাটি বেরুল। তারপরেই মনে হল এই 'রানীমা'র মুখটি অতি পরিচিত। কোথায় জানি তিনি রানীমাকে আগে দেখেছেন। এই রামপুর গ্রামে। প্রায় পনেরো বছর আগে। তখন রানীমা দেখতে ছিলেন ফুটন্ত গোলাপ। আজো তিনি সুন্দরী, তবে অনুতোষের মনে হল 'রানীমা'র মুখে একটু বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। কিন্তু সেদিন

রানীমার এত ঐশ্বর্য ছিল না। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ সাধাসিধে ষোল সতের বছরের মেয়ে। হ্যাঁ রানীমার ঐ উচ্ছল হাসি আজো তার মনে আছে। আজকের রানীমা কে? হয়ত বোম্বাইর এক বিখ্যাত বাঈজী, নর্তকী, নায়িকা…

উপস্থিত সবাই রানীমাকে প্রণাম করবার জন্যে এগিয়ে গেল। স্টেশন মাস্টার বললেন, আপনি আসবেন আমি আগেই খবর পেয়েছিলাম। তাই রেলওয়ে ডাকবাংলো আপনার জন্যে বুক করে রেখেছি। আরও তিনি চারজন আপনার সঙ্গে থাকতে পারবে।

বিজনপ্রসাদ রায়পুর গ্রামের ইস্কুলের মাস্টার। তিনি রানীমার কাছে এসে বললেন, আপনি এসেছেন। আমরা খুশি হয়েছি। সত্যি আপনারা যদি মাঝে মাঝে এখানে না আসেন তাহলে গ্রামবাসীরা বাঁচবে কী করে? এই তো আমার হাইস্কুল। আগে কত ছেলে এখানে পড়ত। আজকাল দেখুন গিয়ে স্কুলের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। ভালো মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখতে পারি না। লাইব্রেরীতে বই নেই। স্কুলের ফাণ্ডে যে টাকা ছিল সব উজাড় হয়ে গেছে।

এবার পুরোহিতমশায় নিজে এলেন। বললেন, আশীর্বাদ করি মা, তুমি এসেছ, খুশি হয়েছি। সুখী হও। শুনেছি তুমি এই গাঁয়েরই মেয়ে। তাহলে গ্রামের উন্নতি করা তো তোমার কর্তব্য। পুরান জমিদারের আমলে ঠাকুরবাড়িতে নহবত বাজত। আর আজকাল সামান্য টাকাও আসে না। একবার ঠাকুরবাড়িতে পায়ের ধুলো দিও মা।'

ডাক্তার সত্য চৌধুরী এগিয়ে এলেন। এল. এম এফ…। মেডিকেল কলেজে পাশ করা ডাক্তার নয়। তবু এর প্রচুর পয়সা। অবিশ্যি রুগীরা পয়সা দিতে পারে না। তাই আমার নাম মাত্র ফীস একটাকা। এতে আর চলে না।

রানী এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। তিনি বেশ ভারিক্কী চালে ট্রেন থেকে নামলেন। তার সঙ্গে ছিল দুটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর। জনতার মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করল, কুকুর দুটি বুঝি আপনার?

রানীমা চশমা খুলে কাঁচ দুটি তার রুমাল দিয়ে মুছে বললেন,

হ্যাঁ, আমি কুকুর পুষি। ওরা বড্ডো বাধ্যের হয়।

চারদিক থেকে চিৎকার শোনা গেল : রানীমা কুকুর পোষেন···

রানীমা কুকুর পোষেন···

স্টেশন মাস্টার এগিয়ে গেলেন। বললেন, রানীমা বড্ডো দেরি হয়ে যাচ্ছে! চলুন ডাকবাংলোয়।

দল বেঁধে সবাই রানীমার সঙ্গে স্টেশনের ডাকবাংলোয় গেলেন। জীর্ণ ডাকবাংলো। অনেকটা জায়গা ভেঙে গেছে। চুণকাম করা দরকার। স্টেশন মাস্টার ম্লান হেসে বললেন, আগে ট্রেনের বড় বড় সাহেবরা এই ডাকবাংলোয় থাকতেন। আজকাল তো আর কেউ থাকে না। তাই এমন দুরবস্থা···। আগের সময় হলে কত আগেই মেরামত হত।

হাসলেন রানীমা। কোন জবাব দিলেন না। সেই মিষ্টিমধুর হাসি। স্টেশন মাস্টার বলতে লাগলেন, আপনাকে কী আর বলব রানী মা। এই গাঁয়ের নেতাদের কেচ্ছার কথা যদি বলি তাহলে রাত কেটে যাবে। এই শহরে কী চলে জানেন? সুরা, নারী, এবং আর কাঞ্চন। পয়সা দিলে আপনি এখানে এসব কিছু পাবেন। সবই জমিদার নীলমাধবের কীর্তি। ওর জন্যে রাস্তা দিয়ে সাহস করে মেয়েদের মান ইজ্জৎ নিয়ে হাঁটবার যো নেই।

গ্রামের কেউ কিছু প্রতিদান করেন না। রানীমা খুব মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

আপনি পাগল হয়েছেন রানীমা? জমিদারের হাতে জনা চারেক গুণ্ডা আছে। দেখতে কালো ষণ্ডার মত। যেদিন জমিদারবাবু ইচ্ছা প্রকাশ করেন ঐ দিনই গুণ্ডারা মেয়েটিকে প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে এল। কোন মেয়ের কিংবা তার বাপের সাধ্যি আছে যে জমিদারবাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তাহলে ওদের গর্দান থাকবে না স্টেশন মাস্টার জবাব দিলেন।

পুলিশ! পুলিশ কিছু করে না? আবার রানীমা জিজ্ঞেস করলেন।

পুলিশ! পুলিশ! আপনি আমাকে হাসালেন রানীমা। এখানকার পুলিশ নামেই পুলিশ। ওরাও যে জমিদারের দলে

আছেন ?

মানে ? রানীমা'র প্রশ্ন ছিল ছোট ।

ওরা জমিদারের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে টাকার অংশ নেন । তার উপর ভাগ বসান এস পি সাহেব এবং শুনেছি ডি এম ওদের কাছ থেকে ঐ টাকা নিয়ে থাকেন । বাজারে এবার জোর গুজব যে জমিদারবাবু দিল্লীর এক রাজনৈতিক দলে মোটা চাঁদা দেন । শুনেছি এবার নাকি ওকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়া হবে । তাই কেউ জমিদারবাবুকে কিছু বলতে পারেন না । তারপর গলার স্বর নিচু করে স্টেশন মাস্টার বললেন একটা কথা বলব রানীমা ?

নিশ্চয় বলুন ।

দেখুন রাত্রে একটু সাবধানে থাকবেন । জমিদারের মোসাহেব এবং গুণ্ডার অভাব নেই । ওরা যদি কখনও আসেন···

এবার রানীমা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন । কুকুর দুটিকে দেখিয়ে বললেন, ওরা আমার প্রহরী । কেউ বদ মতলব নিয়ে এলে এরাই ওদের শাস্তি দেয় ।

তাহলেও মা একটু সাবধানে থেকো । তখন সন্ধ্যা হয়নি । প্রায় গোধূলি ।

ভেতরে আসব মা ? বাইরে থেকে স্কুলের মাস্টারমশায়ের গলা শোনা গেল ।

আসুন···রানীমা জবাব দিলেন ।

স্কুলের মাস্টার বিজনপ্রসাদ ঘরে ঢুকলেন ।

মালক্ষ্মীর দীর্ঘজীবন হোক । এবার মালক্ষ্মী ক'দিন থাকবেন ?

দিন তিনেক—

মাত্র দিন তিনেক । আমরা তোমার আশায় বুক বেধেছিলাম । সবাই বলছে তুমি গ্রামের উন্নতি করতে চাও । পয়সা খরচ করবে···। কিন্তু তিনদিন যে অতি অল্প সময় । এর মধ্যে কী একবার সমস্ত গ্রাম ঘুরে দেখতে পারবে । বড়ো গ্রাম ছিল, মাঠে প্রচুর ধান হত···কি আর আমার স্কুল···এই কথা বলেই বিজনপ্রসাদ চুপ করলেন ।

থামলেন কেন মাস্টামশায় ? বলুন ? তারপর কী হল ?

আমার স্কুলে মেয়েরা আর সাহস করে আসতে পারে না। জমিদার নীলমাধববাবুর ঝোঁক কুড়ি বছর বয়েসের মেয়েদের উপর। আর তার মোসাহেবরা সতেরো আঠার বছরের মেয়েদের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখে।

তাই নাকি? হাসলেন রানীমা।

তুমি হাসছ রানীমা? আমি যখন এই সব নাবালিকা মেয়েদের কথা নিয়ে চিন্তা করি, তখন আমি শিউরে উঠি। দেশে আইন আর শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। আর একটা কথা তোমাকে গোপনেই বলতে হবে। শোন মা আগে স্কুলের ফান্ডে দশ-বারো লাখ টাকা ছিল। আগের জমিদার এই টাকাটা স্কুলের দালান, লাইব্রেরী করবার জন্যে জমা রেখেছিলেন। কিন্তু যেদিন নীলমাধব স্কুলের বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন সেইদিন থেকে কোষাগার শূন্য হল। বাঈজীদের পেছনে তিনি টাকা ঢালতে শুরু করলেন। আর স্কুলের হিসেবের খাতায় লেখা হল : নতুন দালান, তৈরি হচ্ছে। কণ্ট্রাক্টর টাকা লুটছে। এছাড়া কলকাতা থেকে সুন্দরী সুন্দরী বাঈজী, বিলেতী মদ এসে নীলমাধবকে ভেট দিচ্ছে। তোমাকে সব কথা গোপনে বলে গেলাম।

মা আজ প্রায় পঁচিশ বছর এই হাসপাতালে আছি। হাসপাতালের নাড়ী নক্ষত্র সব জানি। এক সময়ে হাসপাতালে টাকা ছিল, ওষুধ ছিল, আরও অনেক ডাক্তার ছিল। কিন্তু সব ধুলোয় মিশে গেছে। বললেন ডাক্তার।

আমি প্রথম থেকে এই হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত আছি। আমার আগের ডাক্তার হঠাৎ এ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেলেন। তারপর থেকে আমি হয়েছি হাসপাতালের ডাক্তার। বাইরে কিছু প্র্যাকটিশ করি। দুচার পয়সা রোজগার হয়···

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা জিজ্ঞেস করলেন, আগের ডাক্তারের এ্যাক্সিডেণ্ট হল কী করে?

হবে না কেন রানীমা। সব কথা আজ খুলে বলব। তিনি ছিলেন পুরানো জমিদারের ডান হাত। তবে জমিদারের সঙ্গে তার বনল না। তাই হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেলেন,

ডাক্তার অম্বাপ্রসাদ জবাব দিলেন। হবে না, শুনুন রানীমা, এই জমিদারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেউ চলতে পারে না। যাক আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। আমাদের হাসপাতালের জন্যে কিছু টাকা চাই। নইলে হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে।

আবার রানীমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। রানীমা বললেন কে জানি বলছিল, যে আগামীকাল আপনারা পঞ্চায়েতের এক সভা ডেকেছেন। ঐখানে কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকা দেওয়া হবে সেইটে নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কিন্তু রানীমা পঞ্চায়েত যে ঐ জমিদার নীলমাধবের পুষ্যিদের নিয়ে তৈরি। আপনি যত টাকাই ঢালুন সবই তার বাঈজীদের পেছনে খরচ হবে।

* * *

সেদিন বিকেলবেলা জমিদার নীলমাধবের বাড়িতে এক বড় জলসা বসল। আজকের জলসার প্রধান বাঈজী হলেন সুপ্রসিদ্ধ পিয়ারী বাঈজী। প্রতি রাত্রে তিনি দশহাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। সন্ধ্যা সাতটার সময় পিয়ারী বাঈজীর আসবার কথা। কিন্তু সাতটা বেজে গেছে তবু বাঈজী এসে উপস্থিত হননি। কী ব্যাপার? তাই জমিদার নীলমাধবের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আসরে বসেছিলেন পুরোহিত ঠাকুর, স্কুলের মাস্টার, ডাক্তার···! বাঈজী আসবার আগে আলোচনার বিষয় ছিল রানীমার রায়পুরে আগমন।

সুরার গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে জমিদার নীলমাধব প্রথমে স্কুল-মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে বিজনপ্রসাদ শুনলাম তুমি নাকি আজ প্রায় ঘণ্টাখানেক ঐ রানীমার সঙ্গে কাটিয়েছ? কী ব্যাপার? এতক্ষণ কী আলোচনা করলে।

বিজনপ্রসাদ সাধারণত জমিদারের জলসায় আসে না। কিন্তু আজ জমিদারের বিশেষ উদ্দেশ্যে জলসায় এসেছিলেন। তিনি বললেন, হুজুর, কী আর বলব। উনি আমাকে স্কুল ফান্ডের টাকাপয়সা নিয়ে হাজার প্রশ্ন করলেন।

তুমি কী বললে ? নীলমাধব প্রশ্ন করলেন।

আসল কথা কিছু বলিনি। শুধু বলেছি স্কুল চালাতে হলে আরো লাখ দুয়েক টাকার প্রয়োজন। আমাদের স্কুলের পুঁজি যা ছিল সবই ফুরিয়ে গেছে।

পুঁজি কোথায় গেছে আশাকরি তার কোন আভাষ দাওনি···

পাগল হয়েছেন ? পুরানো কাসুন্দী ঘাটবো আমি—বিজনপ্রসাদ কৈফিয়তের সুরেই জবাব দিলেন।

তারপর ডাক্তার তুমিও বেশ কিছুক্ষণ ঐ রানীমার সঙ্গে কাটালে। প্রথমে বলল, উনি দেখতে কেমন ?

যৌবনে খুবই সুন্দরী ছিলেন। তবে এখন একটু সৌন্দর্য'র ভাঁটা পড়েছে···

হাসপাতাল সম্বন্ধে কোন কথা হল ? মানে উনি কী হাসপাতালে কিছু দেবেন ? এই প্রশ্ন করেই নীলমাধব জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো হঠাৎ উনি আমাদের গরীব গ্রাম রায়পুরে এলেন কেন, এবং এখানে তার আসবার উদ্দেশ্য এবং টাকা দেবার উদ্দেশ্য কী ?

এবার জবাব দিলেন গ্রামের পুরোহিত। হাজার হোক গ্রামের মেয়ে তো ?

তুমি কী বলছ ঠাকুর ? উনি কবে এখানে ছিলেন ? নীলমাধবের কণ্ঠস্বরে কাঁপা সুর ছিল।

এমনি সময় একজন ভৃত্য এসে বলল, হুজুর একটা দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদ ! আমার কাছে দুঃসংবাদ কে আনে তার স্পর্ধা তো কম নয়···

পিয়ারী বাঈজীর গাড়ির সামনে মানে নীচে একটি সাত বছরের শিশু পড়েছিল। হয়ত ছেলেটি মারা গেছে···

ঘোড়ার নিশ্চয় চোট লেগেছে ?

ঠিক বলতে পারব না···

ইন্সপেক্টর, এসব কী হচ্ছে ? দিন দুপুরে জমিদারের ফিটন গাড়িকে জনতা আটকে দিচ্ছে···আমার কোন ঘোড়ার চোট লাগেনি তো ?

স্যার কেউ আপনার গাড়ি আটকায়নি শুধু একটি সাত বছরের ছেলে ঐ গাড়ির নিচে পড়ে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে। তবে ছেলেটি বেঁচে নেই। মারা গেছে। এক্ষুনি পিয়ারী বাঈজী এখানে আসবেন পুলিশ ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন।

না ইন্সপেক্টর আমাকে ভাঁওতা দিও না। আজ পিয়ারী বাঈজী এলেও ওর নাচের 'মুড' থাকবে না। সাধারণ একটি ছোট ছেলের জন্যে আজ আমার নাচের আসর নষ্ট হল?'

পিয়ারী বাঈজী এলেন সত্যি তবে দুটি কারণে আজ তিনি নাচতে পারলেন না। প্রথমত ঐ শিশু ছেলেটির মৃত্যু তার মানে গভীর শোক সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনি একটু ভৎর্সনার সুরে বললেন, নীলমাধব, তোমার গ্রামের শাসন শিথিল। লোকগুলি আমাকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেন এর আগে কোন মেয়েমানুষ দেখেনি। বেহায়া। তাই আমি দরজা বন্ধ করে আসছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনে দরজা খুলে দেখি যে একটি ছোট ছেলে গাড়ির নীচে চাপা পড়েছে···

আহাঃ বেচারা ঘোড়া। নিশ্চয় ওর পা কেটে গেছে।

পিয়ারী বাঈজী এবার পরবর্তী প্রশ্ন করলেন। বললেন, শুনলাম তোমার গ্রামে এক সুন্দরী মহিলা এসেছেন···

নীলমাধব পিয়ারী বাঈজীর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার চাইতে সুন্দরী। মেয়েটি এই গ্রামেরই। অনেকদিন পরে আবার গ্রাম দেখতে ফিরে এসেছে···

পিয়ারী বাঈজী অত সহজে নীলমাধবের জবাবকে স্বীকার করে নিলেন না। বললেন, না, নীলমাধব তোমার গাঁয়ের মেয়েটি সাধারণ মেয়ে নয়। রাস্তাঘাটে সবাই চিৎকার করে বলছে রানীমা রানীমা···

ইন্সপেক্টর তুমি নিজের কানে পিয়ারী বাঈজীর নালিশ শুনলে। এবার যেমনি করে হোক রাস্তার লোকদের এই শ্লোগান বন্ধ করতে হবে। সবাইকে বলে দাও কাউকে রানীমা বলা মানে জমিদারকে অস্বীকার করা। আর আমি কে জান। দিল্লী বাংলার লাট সাহেবের প্রতিনিধি হলাম। রানীমা অন্য কাউকে বলা বে-আইনী অপরাধ।

পরেরদিন রানীমা রিক্সা করে শহরে ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি মুদিখানার কাছে এসে তিনি তার রিক্সা থামালেন।

কী ব্যাপার? অত চিৎকার হল্লা হচ্ছে কেন? ফুড র‍্যাশনিং দোকান। চাল, গম, চিনির দোকান।

রায়পুর গ্রামে আর কোন র‍্যাশনের দোকান নেই।

আছে! তবে সেই দোকান থেকে জিনিস কালোবাজারে মাল বিক্রি হয়। দোকানের মালিক হলেন জমিদারের মোসাহেব অনুতোষ। ঐ দোকানের অর্দ্ধেক মাল যায় জমিদারের বাড়িতে। বাকিটা কালোবাজারে বিক্রি হয়।

তোমাদের পঞ্চায়েৎ কোথায় বসে? রানীমা জিজ্ঞেস করলেন।

এই তো সামনে বটতলার নিচে।

সভাপতি কে?

কে আবার হবে। ঐ অনুতোষবাবু। এবারও নির্বাচনে অনুতোষবাবু পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট হবার জন্যে দাঁড়িয়েছেন।

কী করে? রানীমা প্রশ্ন করলেন।

এবার স্টেশন মাস্টার জবাব দিলেন, এখানে কী ভোট হয় নাকি? ভোটের নামে রঙ্গ তামাসা হয় রিগিং হয়। ছ'বছর আগে যারা মারা গেছেন তাদের নামও ভোটারের লিস্টে পাবেন। জমিদার-বাবুর লোকেরাই ঐ সব ভোট দিয়ে থাকে।

আজকের পঞ্চায়েতে বেশ লোকজনও হয়েছিল। প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ গ্রামবাসীরা। তাদের সরকার অর্থাৎ জমিদারের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ আছে। কাল জমিদারবাবুর গাড়ির নিচে পড়ে পাড়ার একটি ছেলে মারা গেছে…

শালা চুপ কর। তুই ফের যদি আবার এই কথা বলিস তাহলে তোকে মেরে হাড় ভেঙে দেব। একটা মোটা লোক গুণ্ডারের মত দেখতে লোকটার হাতটি জোরে চেপে ধরল। লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। এদিকে রানীমাকে দেখে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

অনুতোষ এবং পুরোহিত কাছে এগিয়ে এল।

বসুন রানীমা। বসুন। আজ আপনাকে দেখার জন্যেই এত

ভীড়। সবাই প্রসন্ন, কোন নালিশ শুনতে পাবেন না।

অনুতোষ এবার রানীমাকে উপস্থিত জনতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

অনুতোষ বলল, বন্ধুগণ আজ আমাদের মাঝখানে রানীমাকে পেয়ে ধন্য বোধ করছি। রানীমা এই গ্রামের মেয়ে। তিনি গ্রামের উন্নতি করবার জন্যে কিছু টাকা বিলোতে চান। তার এই ইচ্ছা আমাদের শিরোধার্য···

এবার পুরোহিত অনুতোষের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলল, আপনারা নিশ্চয় রানীমার কথা শুনেছেন। রানীমা এই গাঁয়ের মেয়ে। উনি গ্রামের উন্নতি করতে চান। তার আগমন উপলক্ষে আজ আমরা এই জলসা ডেকেছি। কাল শহরের দোকানপাট বন্ধ থাকবে। বলুন রানীমা, আমরা আপনার জন্যে কী করতে পারি।

কিছু না, আমি ঠিক করেছি ঐ মিউনিসিপ্যালিটির সামনে যে ভাঙা বাড়ি আছে সেই বাড়িটা দু'লাখ টাকা দিয়ে কিনব?

অনুতোষ অভিযোগের সুরে বলল, ঐ ভাঙা বাড়ি আপনি দু-লাখ টাকা দিয়ে কিনবেন। আমাদের জমিদার-সাহেবের বাগান বাড়ি আরো সুন্দর। মাত্র তিন লাখ টাকায় তিনি ঐ বাড়ি বিক্রি করবেন···

তাহলে বাঈজীর নাচ কোথায় হবে? এবার অনুতোষের বিস্ময়ের পালা। কিছুক্ষণের জন্যে সে হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, আজকাল বাঈজীর নাচ তো বন্ধ হয়ে গেছে···

ম্লান, মৃদু হেসে রানীমা বললেন, হঠাৎ তার এই পরিবর্তন হল কেন? অনুতোষ ম্লান হেসে বলল, আজকাল ওর টাকাপয়সার টানাটানি চলছে। তাই জলসা ঘর বিক্রি করতে চাইছে।

রানীমা এবার স্কুলের হেডমাস্টারমহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিই তো এই স্কুলের মাস্টারমশায়?

সেকী মা, তুমি আমাকে এত শিগগির ভুলে গেলে। মাস্টারমশায় জবাব দিলেন। এই তো খানিক আগে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে এলাম।

না, তখন আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। চিনতে পারেননি

যে আমি ছিলাম এই গ্রামের মেয়ে—আপনারই ছাত্রী···রানীমা বলল।

তুমি বলছ কী মা? তুমি আমার স্কুলের ছাত্রী। এ যে আমাদের স্কুলের গর্ব। তাহলে তোমার সম্মানার্থে একদিন ছুটি দেব।

অবশ্য আমি আপনার খুব বাধ্যর ছাত্রী ছিলাম না। প্রায়ই স্কুলে দেরি করে আসতাম বলে আপনি ধমক দিতেন।

আমি সবাইকে ধমক দিয়ে থাকি। বুড়ো হয়েছি বলে আজকাল একটু বেশি ধমকানি দিই। অবশ্যি তুমি আমার মেধাবী ছাত্রী ছিলে কিনা? তুমি তো চমৎকার গান করতে···

প্রতিবাদ করল রানীমা। বলল, না, মাস্টারমশায় আমি কোন-দিনই মেধাবী ছাত্রী ছিলাম না। গানও করতাম না। দু-তিনবার ক্লাসে ফেল করেছিলাম। তারপর আপনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ, তোর পড়াশুনা হবে না। বরং তুই যদি আমার কাছে প্রাইভেট কোচিং নিস···তাহলে হয়ত তোর একটা হিল্লে হতে পারে।

প্রাইভেট কোচিং!

হ্যাঁ আপনি আমাকে প্রতি সন্ধ্যায় আপনার বাড়িতে যেতে বললেন। বললেন, আপনি আমাকে অঙ্ক, ভূগোল বিশেষ করে শেখাবেন। অবশ্যি তখন আপনি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন না। ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম···

হাসলেন স্কুলের হেডমাস্টার। বললেন, শিক্ষাদানই তো মাস্টারদের কর্তব্য। স্কুলের মাস্টারদের কর্তব্য···

আবার হাসল রানীমা। বলল, না আপনি আমাকে কোন শিক্ষাদান করেননি এবং প্রাইভেট কোচিং দেননি। যে শিক্ষা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন সেই শিক্ষা ছিল আদিম যুগের 'রিপুর' দর্শন। আমার মনে পড়ে···

এবার স্কুলের হেডমাস্টার একটু উত্তেজিত ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, বল, বল কী বলবে বল?

আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি

পড়ছিল। আমার দৃষ্টি ছিল বৃষ্টির দিকে। ঠিক এমনি সময়ে···

আবার উত্তেজিত কণ্ঠে হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, বল, বল তারপর কী হল ?

আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এত আচম্‌কা ধরেছিলেন যে আমি চমকে উঠেছিলাম। বলবার চেষ্টা করেছিলাম মাস্টার-মশায়···। কিন্তু তার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ একটানা লম্বা চুমু···। আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম, কী জবাব দেব ভাবতে পারিনি। আপনি আমাকে বললেন—ভয় পাসনে। তুই সুন্দরী, রূপসী···। তোকে দেখলে অনেক পুরুষই জড়িয়ে ধরবে। প্রথম প্রথম একটু লজ্জা লাগবে। তারপর সবই গা সওয়া হয়ে যাবে। তখনই আমার কথা আপনার মনে হবে।

না, না তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমি কোন মেয়ের ঠোঁটে কেন, গালেও চুমু খাইনি। কোনদিনই আমার মাথায় এত খারাপ প্রবণতা মনে জাগেনি···

হাসল রানীমা। অতীত দিনের একটি মেয়েকে পাশের পথে নিয়ে গেলেন—একথা অস্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছেন কেন ? আপনি তো শিক্ষক। সত্যি কথা বলা আপনার ধর্ম···

কিন্তু মা তুমি মিথ্যে কথা বলছ···

মিথ্যে কথা আমি বলছিনে। আপনি সভার মাঝখানে নিজের মানসম্মান বাঁচাবার জন্যে এই মিথ্যে কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, হঠাৎ আপনার এই 'প্রাইভেট কোচিং'-এর খবর এবং আপনি যে আমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছেন সেই কথা বাজারে রটে গেল। অবশ্যি এই 'স্ক্যাডাল' রটাবার পেছনে আপনিই ছিলেন। কারণ ঐ সময়ে আমাদের স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় হয়েছিল। আপনি তাকে প্রাইভেট কোচিং দিতে শুরু করলেন। অতএব আমার চরিত্রে কলঙ্কের দাগ এঁকে আপনার ভবিষ্যৎ পথ থেকে সরাবার প্রয়োজন ছিল।

মিথ্যে কথা। তুমি সব গুলিয়ে ফেলছ। আমি কোন মেয়েকে

কোন প্রাইভেট কোচিং দিইনি। তোমাকে তো নয়ই। এছাড়া গানবাজনায় নাচে গানে তুমি ছিলে তুখোড়···অবশ্যি স্বীকার করি পড়াশুনায় তুমি অতো তুখোড় ছিলে না।

চারদিকের জনতা চীৎকার করে উঠল। বলল, রানীমা, আপনি জানেন না, আপনার চোখের সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটি হল চোর। জমিদারের পরামর্শে স্কুলের ফাণ্ড চুরি করেছে।

মিথ্যে কথা। স্কুলের কোন ফাণ্ড ছিল না।

'ছিল। সরকারি কাগজ, ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট···' আর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন। আপনি এবং জমিদারবাবু ঐ টাকা লুটে খেয়েছেন। পরে সবাইকে বলেছেন উই পোকায় ঐ কাগজগুলি খেয়ে ফেলেছে।

মিথ্যে কথা। আমি বলছি আপনি ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন···

না যা রটে তা বটে। শুনুন রানীমা, এই যে স্কুলের মাস্টারকে দেখছেন ইনি হলেন এক লম্পট চোর। সবাই জানে লোকটি এবং জমিদারবাবু স্কুলের ফাণ্ড চুরি করেছেন···।

আপনি কে? রানীমা জিজ্ঞেস করল।

আমি ডাক্তার। এই গ্রামের হাসপাতালের ডাক্তার। আজ প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ এই হাসপাতালে ডাক্তারি করছি।

হাসল রানীমা।

বলল, পঁচিশ বছর যাবৎ আপনি এই হাসপাতালের ডাক্তার···

একটু চিন্তা করে ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ, আজ প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ এই গাঁয়ে আছি।

ডাঃ অনাদি বোস···

ডাঃ অনাদি বোস? 'নামটা আমার কাছে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, পুরোহিতঠাকুর জবাব দিলেন। আপনি ভুল বলছেন ডাক্তারবাবু। পনের বছর আগে অনাদি বোস এই হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারবাবু আপনি তো তখন ছিলেন এ্যাসিস্টাণ্ট ডক্টর।'

একটু লজ্জিত হয়ে আমতা আমতা করে ডাক্তারবাবু বললেন,

হ্যাঁ, অনাদি বোস এই হাসপাতালের 'মেডিকেল অফিসার' ছিলেন। আমি ছিলাম তার সহকারি···ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন।

পুরোহিত ও পুলিশ ইন্সপেক্টর চিৎকার করে বললেন, না পুরানো জমিদারের আমলে এই হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন অনাদি বোস। নতুন জমিদার নীলমাধব এলেন। তিনি জমিদার হবার পরই ডাক্তার অনাদিবাবু হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। তারপরই আপনি হলেন এই হাসপাতালের ডাক্তার। রানীমা অনাদি বোস, আপনার বাবা। সত্যি বড়ো ভালমানুষ ছিলেন।

স্টেশনমাস্টার এতক্ষণ মুখ খোলেননি। এবার তিনি মন্তব্য করলেন, তার মৃত্যু ছিল রহস্যজনক। বলুন ডাক্তারবাবু হঠাৎ তার মৃত্যু হল কেন?

হার্ট ফেল!

ইন্সপেক্টর এবার মন্তব্য করলেন, না, আমার মনে হয় তার মৃত্যু ছিল এ্যাকসিডেণ্ট।

এ্যাকসিডেণ্ট নয়, ইন্সপেক্টর সাহেব। তাকে খুন করা হয়েছিল। আর সেই খুনের রহস্যকে আপনি ধামাচাপা দিয়েছিলেন···

এবার ইন্সপেক্টরের মুখ রক্তিম হল। তার মুখ দেখে মনে হল তিনি রেগে গেছেন।

আপনি এসব কী বলছেন রানীমা···

রানীমা হাসল। বলল, একদিন বর্ষাক্রান্ত রাত্রে আপনাদের বর্তমান ডাক্তার, উনি ছিলেন তখন বাবার হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। তিনি এলেন। বললেন, বাবাকে একটা জরুরী কেসে বাইরে যেতে হবে। ঐ ঝড়ো রাত্রে বাবা বাইরে যেতে চাননি। কিন্তু কম্পাউণ্ডার বললেন, কেসটি খুবই জরুরী। বাবার যাওয়া আবশ্যক। বাবা চলে গেলেন এবং আর ফিরে এলেন না। বাড়িতে আমি একাই ছিলাম।

এবার বলল আমার বাবা কেন ফিরে আসেননি···।

আপনার কোন কথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি শুধু জনসাধারণের কাছে আমাকে অপদস্থ করবার জন্যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলছেন। ডাক্তার জবাব দিলেন।

এবার রানীমা হাততালি দিয়ে ডাকলেন, সুরেন।

মধ্যমবর্ষীয় বেঁটে একটি লোক এগিয়ে এল।

একে চিনতে পারছেন? রানীমা জিজ্ঞেস করল।

না, পঞ্চায়েতের সবাই একসঙ্গে জবাব দিল।

এর নাম সুরেন। সুরেন পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কাজ করতেন। বলুন, ইন্সপেক্টর একে চিনতে পারছেন?

হঠাৎ থতমত খেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। সুরেন রায়পুরের পুলিশ বাহিনীর হেড কনস্টেবল ছিল। প্রায় পনের বছর আগে কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে একে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এর কথার কী মূল্য আছে?

মূল্য আছে। আপনাদের কথার কী মূল্য আছে। যদি আপনাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, চুরি, বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ করা হয় তাহলে আপনাদের সবারই চাকুরি যাবে। যাক সুরেনের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছিল এবার সেইটে শোনা যাক। বল সুরেন, আমার বাবার মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কী জান?

তার কোন এ্যাক্সিডেন্টাল মৃত্যু হয়নি। তাকে জোর করে হত্যা করা হয়েছিল।

কেন?

কারণ জমিদার নীলমাধববাবু তাকে দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই রাত্রেই তাকে বলা হল একটি 'এ্যাবরশন' কেস করতে হবে···। তিনি ঐ 'এ্যাবরশন' কেস করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই রাত্রে ফিটন গাড়ি করে উনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন জমিদারের চারজন ভাড়াকরা গুণ্ডা তাকে হত্যা করে। বর্তমান ডাক্তারবাবু মানে উনি তখন সামান্য কম্পাউণ্ডার ছিলেন, ওর ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছিলেন। সাধারণ মৃত্যু।

পুলিশ ইন্সপেক্টর চিৎকার করে বললেন, মিথ্যে কথা। আমি জানি ডাঃ অনাদি বোসের গাড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল।

না, সুরেন প্রতিবাদের গলায় বলল। আমি ছিলাম ঐ

ইনভেস্টিগেশনের হেড কনস্টেবল। আমি সব জানতাম এবং জানতাম বলেই জমিদার নীলমাধবের নির্দেশে আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আর সাস্‌পেনসনের অর্ডার দিয়েছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

আমি বলছি মিথ্যে কথা—

রানীমা হাসল। বলল, কে সত্যি কথা বলছে, কে মিথ্যে কথা বলছে এক্ষুণি প্রমাণ হবে।

এবার বাবা মারা যাবার পর আমি একাই বাড়িতে থাকতাম। আমার বয়স তখন সতেরো।

একদিন-বৃষ্টিবাদলার দিনে আমি ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। জলে আমার জামাকাপড় ভিজে গিয়েছিল। আমাকে দেখে এই ঠাকুরমশায় এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, ভেতরে এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন ?

আমি ভেতরে গেলাম···এই বলে রানীমা থামলেন। পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস কবলেন, ঠাকুরমশায় বলুন, তারপর কী হল ?

থতমত খেয়ে গেলেন পুরুতঠাকুর। বললেন, আপনি কবের কথা বলছেন রানীমা ?

আজ থেকে পনের বছর আগে। ডাক্তারের মেয়ে মালতীকে মনে পড়ে···

তুমিই মালতী ?

তখন ছিলাম মালতী। আজ হয়েছি মালতী বাঈজী। বোম্বাই-এর বিখ্যাত মালতী বাঈজী···

উপস্থিত জনতা প্রায় সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। মালতী বাঈজী···আপনি তো কোটিপতি···

হ্যাঁ, সেদিন ছিলাম না। ছিলাম গরীব, কপর্দকহীন। সেদিন পুরুতঠাকুর আমার ইজ্জত নিয়েছিলেন। তাই নয় কী ?

মিথ্যে কথা···

সুবীর—এবার রানীমা চীৎকার করে ডাকলেন।

একটি ষণ্ডার মত লোক এসে উপস্থিত হল। লোকটি নিজের নাম সুবীর বলে।

একে চেনেন ঠাকুরমশায় ?

প্রথমে না চিনবার ভান করলেন। সুবীরই বলল, আমি যে মন্দিরের দারোয়ান ছিলাম। সেদিন রাত্রে আপনি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে 'রানীমা'র ইজ্জত নিয়েছিলেন।

মিথ্যা কথা—আবার তীব্র প্রতিবাদ করলেন পুরুতমশায়।

না সত্যি কথা। কারণ সেদিন আপনার হাত থেকে 'রানীমা'কে আমিই বাঁচিয়েছিলাম। তারপর কী হল ?

এই যে পুরুতঠাকুরকে দেখছেন, গেরুয়া পড়েছেন, কপালে তিলক কেটেছেন, উনি ভণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ গেরুয়া, ধর্ম সবই ওর মুখোস। সাধারণত শয়তানদের চাইতে উনি বেশি বদমাশ···

উনি তারপর কী করলেন ? জনতা আবার চীৎকার করে উঠল।

পুরুতমশায় আমাকে জমিদার নীলমাধবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিথ্যা কথা ! আবার পুরুতমশায় প্রতিবাদ করলেন।

অপূর্ব—রানীমা আর একজনকে ডাকলেন।

আর একজন মধ্যমবয়সীয় ভদ্রলোক, তার নাম অপূর্ব এগিয়ে এল। চিনতে পারছেন পুরুতমশায়—আমি অপূর্ব···

হ্যাঁ, রানীমা সত্যি কথাই বলেছেন। অপূর্ব বলল !

সেদিন সন্ধ্যার পর আমাকে দিয়ে আপনি রানীমাকে জমিদার নীলমাধবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর যেসব কাহিনী হয়েছিল সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। তাহলে আপনারা সবাই লজ্জা পাবেন। শুধু এইটুকু বলতে চাই, একটি নিরপরাধ মেয়েকে আপনারা নিজেদের ভোগ লালসার জন্যে ব্যবহার করেছেন।

এবার অনুতোষ পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, আপনি পঞ্চায়েতের কাছে বিচার চাননি কেন ?

হাসল রানীমা। বিদ্রুপ তাচ্ছিল্যের হাসি। বিচার চেয়েছিলাম। আপনিই তো ছিলেন সেইদিন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। আপনি

আমার নালিশকে কানে তুললেন না। স্কুলের মাস্টারমশায় বললেন আমি খারাপ মেয়ে। ইন্সপেক্টরসাহেব বললেন, দেহ বিক্রি আমার পেশা। পুরুতঠাকুর আমার ইজ্জত নিলেন এবং জমিদারবাবুর লালসাকে পূর্ণ করবার জন্যে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আর আপনি আমার নালিশকে অগ্রাহ্য করলেন।

অন্যায়, অন্যায়। আবার এই বিচার করা হোক। আজ আমাদের কাছে বিচার করবার জন্যে নতুন তথ্য আছে। জনতা দাবী করল।

না হয়না, এরা যে সত্যি কথা বলছেন তার কোন প্রমাণ আমরা পাই নি···অনুতোষবাবু জবাব দিলেন। এছাড়া আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন জমিদার নীলমাধব। তার অনুমতি ছাড়া আমরা কিছু করতে পারব না।

তাহলে আপনি কী চান বলুন? যদি আমাদের সাধ্যর মধ্যে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয় করব।

আবার দাম্ভিকের হাসি হেসে রানীমা বললেন, আমি বিচার চাই। যারা আমাকে এই গণিকার পথে নামিয়েছেন তাদের বিচার চাই।

না, আমরা আপনাকে বিচার দিতে পারব না। আমরা ভেবেছিলাম আপনি গ্রামের জন্যে কিছু টাকা দান করবেন···

হ্যাঁ সেই টাকা আমি দেব। কিন্তু তার বদলে আমি বিচার চাই—

টাকার পরিবর্তে বিচার চান? একী হাসির কথা বলছেন। টাকা দিয়ে বিচার কেনা যায় না অনুতোষ হাসির গলায় বললেন।

টাকা দিয়ে সব পাওয়া যায়। ভগবান, মানুষ ধর্ম এমনকী বিচার? আজকাল সব কিছুর মূল্য যাচাই করা হয় টাকা দিয়ে, রানীমা বলল।

আপনি এই বিচার পাবার জন্যে কত টাকা খরচ করবেন—

ধরুন যদি বলি পঞ্চাশ লাখ—রানীমা জবাব দিল।

এযে অনেকগুলি টাকা। এক টাকা নয়, দুটাকা নয়, পঞ্চাশ লাখ টাকা—

পুলিশ ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন। কারণ গ্রামের বিচার কিংবা দোষীদের সাজা দেবার দায়িত্ব আমার।

কিন্তু সেদিন আপনি এই দায়িত্ব অবহেলা করেছিলেন।

সেদিন কেউ বিচার পাবার জন্যে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিতে রাজি হয়নি। আজ আপনি দিতে রাজি হয়েছেন। এবার বলুন আপনি কী ধরনের বিচার চান? পুলিশ ইন্সপেক্টর আবার জিজ্ঞেস করলেন।

এই গ্রামের জমিদার নীলমাধববাবুর বিচার চাই। আজ তিনি আমার সর্বনাশ করেছেন। শুধু আমি নই, তিনি হাজার হাজার নিষ্পাপ মেয়ের সর্বনাশ করেছেন এবং তাদের ইজ্জত নিয়েছেন। কাল ওর ফিটনগাড়ির নিচে পড়ে এই গাঁয়ের একটি ছোটছেলের প্রাণ গিয়েছে। এর বিহিত করুন এবং ওর বিচার করুন।

হ্যাঁ নীলমাধববাবুর বিচার! জমিদারবাবুর বিচার। এবং যিনি ওর প্রাণ নিতে পারবেন আমি তাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দেব। রানীমা বললেন। তারপর আবার বলতে লাগল, যিনি ওর প্রাণ নিতে পারবেন তাকে পঁচিশ লাখ টাকা এবং সমস্ত গ্রাববাসীকে পঁচিশ লাখ টাকা দেব।

টাকার অংক শুনে গ্রামবাসীরা সবাই অস্ফুটধ্বনি করে উঠল। কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারল না জমিদারকে খুন করলে এতগুলি টাকা পাওয়া যাবে। আপনি সত্যি সত্যি আমাদের এতগুলি টাকা দেবেন।—

আমার চার সুটকেশ ভর্তি এই পঞ্চাশ লাখ টাকা আছে। যেদিন জমিদারকে খুন করা হবে সেদিনই এই টাকা গ্রামকে দেওয়া হবে।

এই প্রস্তাব আপত্তিকর, সিডিশাস্। আপনি কাউকে খুন করবার জন্যে উত্তেজিত করতে পারেন না।

টাকা আইন তৈরি করতে পারে এবং আইনকে ভাঙতে পারে রানীমা বলল। আমার এই পঞ্চাশ লাখ টাকা শুধু একজনকে খুন করবার জন্যে নয়, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। আপনারা আমার এই প্রস্তাব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখতে পারেন।

অনুতোষ আবার চিৎকার করে বলল, অসম্ভব। কাউকে খুন করা পাপ, বেআইনী।

না প্রেসিডেণ্ট, ইনি এমন কিছু বেআইনী কথা বলেননি। শুধু একটা প্রস্তাব করেছেন। এখন আমাদের এই প্রস্তাব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখা দরকার। তলিয়ে দেখা। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা।

কিন্তু কাউকে খুন করতে বলা আইন বিরোধী।

হাসলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

বললেন, দেখুন প্রতিদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলেন, আমাকে খুন করবেন। উনি কী সত্যি সত্যি আমাকে খুন করেন? ওর কথাগুলিও তো 'সিডিশাস'—। মেয়েদের এইসব কথায় কান দিতে নেই। তবে রানীমার কথার ভেতর যুক্তি আছে। আজ যদি গ্রাম পঞ্চাশ লাখ টাকা পায় তাহলে আমাদের দুঃখ কষ্টের কত সুরাহা হবে! আর জমিদারবাবু তো গ্রামের উন্নতির পথের প্রতিবন্ধক হয়েছেন। আচ্ছা রানীমা এই পঞ্চাশ লাখ টাকা আপনি কীভাবে দেবেন? ক্যাশ না চেক—

হাসল রানীমা। বলল, আমার সঙ্গে পাঁচটা সুটকেশ ভর্তি টাকা আছে। মোট পঞ্চাশ লাখ টাকা। আর যিনি নীলমাধবকে খুন করবেন তিনি পাবেন পঁচিশ লাখ টাকা। আর গ্রাম পাবে পঁচিশ লাখ টাকা।

উপস্থিত জনতা চীৎকার করে উঠল। আমরা রানীমার এই প্রস্তাব স্বীকার করে নিচ্ছি—

এই বলে সবাই রানীমা কী জয় বলে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

*　　*　　*

সন্ধ্যার পর মোসাহেবদের দল নিয়ে জমিদার নীলমাধববাবু মদ খাচ্ছিলেন। প্রথমে অনুতোষ বলল, আপনি তো আজ পঞ্চায়েতের সভায় কী আলাপ-আলোচনা হয়েছে, শুনেছেন?

মদের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে নীলমাধববাবু বললেন, তোমরা কী বললে? মেয়েটির আস্পর্ধা তো কম নয়?

আমি তো দেখতে পেলাম যে পুলিশ ইন্সপেক্টর রানীমার সঙ্গে

বেশ হেসে গল্প-গুজব করছে। হাতে হাভানা সিগার···

নীলমাধব বলল, ইন্সপেক্টরের আস্পর্ধা তো কম নয়। মেয়েটি আমাকে খুন করতে চাইছে···আর পুলিশ-ইন্সপেক্টর কিনা ওর সঙ্গে গল্প-গুজব করছে। স্ক্যাণ্ডালাস। দাঁড়াও, এস, পিকে বলে ওকে চাবকে দেব। এই থানায় গিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বল, আমি ডাকছি।

বেয়ারা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, স্যার, বলছে এখন আসতে পারবে না। ওর হাতে কাজ আছে।

হাতে কাজ আছে? উল্লুক, শুওর···জমিদার নীলমাধব গর্জে উঠলেন।

হ্যাঁ স্যার, উনি দপ্তরে বসে এক বড় সুগন্ধি সিগার খাচ্ছিলেন। টেবিলের উপর দেখলাম অনেকগুলি—

সিগার! বলছিস কিরে? নীলমাধব বিস্ময় প্রকাশ করলেন। ইন্সপেক্টর তো কখনও সিগার খায়না—।

শুনেছি তো রানীমা সবাইকে জিনিস কিনে দিয়েছেন। ইন্সপেক্টরকে নিশ্চয় সিগার কিনে দিয়েছেন। আমাকে রানীমা একজোড়া শাড়ি কিনে দিয়েছেন। স্যার সমস্ত গাঁ দেখলে মনে হয় চারদিকে জিনিসপত্রের হরিলুট চলছে।

জমিদার নীলমাধববাবু বললেন, বুঝেছি তোর রানীমা সবাইকে লোভ দেখিয়ে কিনে নিচ্ছেন। তুই আগে আমায় হুজুর বলতি এখন রানীমার কাছ থেকে দুই জোড়া শাড়ি পেয়ে গলার সুর পাল্টে ফেললি।

বেয়ারা কোন জবাব দিল না। ডাক্তারকে ডেকে আন জমিদার নীলমাধব হুকুম দিলেন। এবারও বেয়ারা নড়বার কোন লক্ষণ দেখাল না। জবাব নিল অনুতোষ, শুনেছি রানীমা হাসপাতালের জন্যে প্রচুর টাকা দিয়েছেন। হাসপাতালের জন্যে এই টাকা খরচ করবেন কিনা জানি না। তবে উনি রানীমার দেয়া টাকার হিসেব করছেন।

তুমি কী বললে অনুতোষ? রানীমা টাকা দিয়ে সবাইকে কিনে নিয়েছেন।

আমার তো মনে হয় আপনাকে ছাড়া উনি সবাইকে প্রায় কিনে নিয়েছেন।

বল কী অনুতোষ? উনি কী তোমাকেও কিনেছে নাকি। ভালবাসার চাইতে টাকার মূল্য কী বেশি না ভালবাসার দাম অনেক বেশি।

আজ প্রায় দশবছর যাবৎ গায়ের লোকেরা ভালবাসার কোন চিহ্নই এখানে দেখতে পায়নি। আমাকেও রানীমা কিছু টাকা সেধে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যান, কার সঙ্গে দেখা করেন, পাড়ায় আপনার জনপ্রিয়তা কী প্রকার? এ সব খবর দিয়ে রানীমা কী করবেন? জমিদার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কাউকে খুন করতে হলে তার গতিবিধি, যাতায়াত কখন কী করেন জানা একান্ত আবশ্যকতা। আমাকে বললেন' অনুতোষ তুমি জমিদারের একান্ত অনুগত লোক। তুমি যদি ওর গতিবিধির সব খবর দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে দু'লাখ টাকা দেব—।

তুমি কী বললে? উৎকণ্ঠিত হয়ে জমিদার জিজ্ঞেস করলেন।

অনুতোষ হাসল।

বলল, আপনি কী ভাবছেন। আপনাকে টাকার জন্যে ওর কাছে বিকিয়ে দেব। আমি ঐ রকম লোকই নই।
তবে দু'লাখ টাকা কম নয়। সামনেই মেয়ের বিয়ে। কিছু টাকারও দরকার। গিন্নী বললেন, নিয়ে নাও কিছু টাকা? গ্রামের সবাই যখন টাকা নিচ্ছে…

গ্রামের সবাই টাকা নিচ্ছে? জমিদার আবার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

জানেন না বুঝি? গ্রামে টাকার হরির লুট পড়েছে। ঐ পুরুত ব্যাটা, প্রায় লাখ দুই টাকা নিয়েছে। অনুতোষ বলল।

পুরুত আমাকে খুন করবার জন্যে দু'লাখ টাকা নিয়েছে। তুমি আমাকে অবাক করলে। ঐ হারামজাদার চরিত্র কী আমি জানি। গ্রামের কোন বিধবাদের পুরুতব্যাটা রেহাই দেয়নি। ধর্মের নাম ঠাকুরের নাম করে বিধবাদের ধরত। বিধবাদের বলত জমিদারবাবুর প্রসাদ পাবি? তারপর সন্ধে হলেই ওদের আমার কাছে নিয়ে আসত

কথা বলতে গিয়ে জমিদারবাবুর কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে উঠল। সত্যি অনুতোষ ঐ পুরুত, মাস্টার সবাই আমার কাছে মেয়েগুলিকে ভেট দিয়েছে। আমি নিজের থেকে কোন মেয়ে ওদের কাছে চাইনি। এছাড়া ঐ মন্দিরের ফাণ্ড স্কুলের ফাণ্ড ওরাই চুরি করেছে। মেয়ে ভেট করবার সময় বলেছিল, ঐ সব ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা তুলবো, আপনি সই করুন।

এর বদলে ওরা আমাকে মেয়েদের ভেট দিয়েছে!

আলোচনায় বাধা পড়ল।

অনেক দূর থেকে দুইটি কুকুরের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। ঐ ডাক শুনে জমিদার চমকে উঠলেন।

অনুতোষ ওটা কিসের ডাক?

পাগলা কুকুরের। রানীমা তার সঙ্গে দুটো কুকুর নিয়ে এসেছিলেন। শুনেছি ওরা নাকি পাগলা হয়ে গেছে—অনুতোষ জবাব দিল।

কুকুর পাগলা হয়েছে। কুকুর পাগলা হওয়া বড় খারাপ লক্ষণ। বিপদের সম্ভাবনা আছে অনুতোষ।

তারপরই শোনা গেল জনতার কোলাহল! তুমুল চীৎকার। হৈ-হল্লা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সেই চিৎকার যেন জমিদার নীলমাধবের বাড়ির দিকে এগিয়ে এসেছে।

এবার জমিদারের কণ্ঠে ভয়ের সুর পাওয়া গেল। অনুতোষ, আমার মনে হয় গ্রামের জনতা আমার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ প্রতিবছর এই দিনেই তো গ্রামের লোকেরা আমাকে অভ্যর্থনা, অভিনন্দন জানাতে আসে। আজও হয়ত আসছে। কিন্তু আজ রাত্রে আসছে কেন?

হাসল অনুতোষ। শয়তানের হাসি। বলল, দেখুন আমার কী মনে হয় ওরা আজ কিন্তু অভ্যর্থনা কিংবা অভিনন্দন জানাতে আসছে না। ওরা হয় রানীমার হারান কুকুর কিংবা আপনাকে খুঁজতে আসছে—

আমাকে খুঁজতে আসছে? কেন, কেন আমি কী করলাম? জমিদার নীলমাধবের গলার স্বর ক্রমেই নিচু সুর হল। ভয়ের সুর।

ওরা যে বিদ্রোহ করেছে—

না, ওরা বিদ্রোহ করেনি। বিপ্লব শুরু করেছে।

কেন আপনি তো জানেন, রানীমা আপনার মাথার মুণ্ডুর উপর পঁচিশ লাখ টাকা দাম বসিয়েছেন। তাই ঐ জনতা হয়তো এবছর আপনাকে অভ্যর্থনা করবে না, মাথা দাবী করবে। অনুতোষ বলল।

তুমি ঠিক জান? আবার জমিদার জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, যে পঞ্চায়েত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আপনার মুণ্ডু নিলে পঁচিশ লাখ টাকা দেওয়া হবে ঐ পঞ্চায়েতের সভার সভাপতিত্ব করেছিলাম।

তুমি ঐ পঞ্চায়েতের সভাপতি ছিলে? বিস্ময়ে অবাক হয়ে জমিদার নীলমাধব জিজ্ঞেস করলেন। তুমি? তুমি ঐ পঞ্চায়েতের সভাপতিত্ব করেছিলে। তুমি প্রতিবাদ করোনি···

আমি যদি প্রতিবাদ করতাম তাহলে ওরা আমার মুণ্ডু নিত। এছাড়া ওরা আপনার মুণ্ডু চাইছে, আমার তো নয়···

তাহলে তুমি আমাকে কী করতে বল? জমিদারবাবু প্রশ্ন করলেন।

পালিয়ে যান। নইলে প্রাণে বাঁচবেন না···অনুতোষ জবাব দিল।

তুমি বলছ অনুতোষ? আমি রায়পুর গ্রামের জমিদার নীলমাধব —বিখ্যাত জমিদার বেণীমাধবের ছেলে, সূর্য বংশের সন্তান, এতদিন এই গ্রামে রাজত্ব করছি। আর তুমি কিনা বলছ, পালিয়ে যান···

নইলে প্রাণে বাঁচবে না। এই আমার শেষ উপদেশ।

কিন্তু পালাবার পথ কোথায়? ঐ পাগল জনতা যে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে আসছে···জমিদারবাবু ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন।

আপনি আমার সঙ্গে আসুন জমিদারবাবু। পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার একটি রাস্তা আছে···

তুমি আমাকে পালাতে বলছ?

অনুতোষ জবাব দিল, হ্যাঁ।

অনুতোষ জমিদার নীলমাধবকে নিয়ে পেছনের গেটের কাছে

এল। বাইরে ঘন অন্ধকার···

কিন্তু দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল। দেখা গেল, হাজার হাজার জনতা, হাতে মশাল···'জমিদারবাবুর মুণ্ডু চাই' বলে এগিয়ে আসছে।

অনুতোষ আমরা কোথায় এলাম। ঐ যে জনতার দল। ওরা আমার রক্ত চাইছে। অনুতোষ তুমি যে আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছ···

না, পালাতে হলে আপনাকে এই পথ দিয়ে পালাতে হবে। ঐ মশালধারী জনতা রানীমার দুটি পাগলা কুকুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে···

না, না ওরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনুতোষ তুমি বাঘের খাঁচার সামনে আমাকে ছেড়ে দিলে। তুমি আমার সঙ্গে এই বেইমানী করলে। আমি তোমার জন্যে কী না করেছি। আজ পনের বছর যাবৎ আমি তোমাকে গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট করেছি। তোমাকে টাকা দিয়েছি, বাড়ি, গাড়ি, সবই তো তোমাকে দিয়েছি। আজ তুমিও রানীমার পক্ষ নিলে···

হাসল অনুতোষ। বলল, আপনি করেছিলেন কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি কী কিছু করতে পারবেন? পারবেন না। আমি পশ্চাৎ অতীত নিয়ে আর বসে থাকতে চাইনে। আমার চোখের সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন তার চারগুণ আমি আপনার জন্য করেছি। জমিদার ফাণ্ডের টাকা ভাঙা, প্রজাদের ঠেঙিয়ে কর আদায় করা, যারা কর দেয়নি তাদের বউদের চুরি করে আনা, কার বাড়িতে আগুন দেওয়া, ডি-এমকে সন্তুষ্ট রাখা সবই তো আমি করেছি। আপনি কী করেছেন। শুধু বসে বসে মদ খেয়েছেন আর বাঈজীর ঘুঙুরের নাচ শুনেছেন। না, আমি শুধু শুধু আপনার জন্য বদনাম কিনেছি। এবার আমাকে ভিন্ন পথ দেখতে হবে। এই বলে অনুতোষ চলে গেল।

বাড়ির বাইরে জমিদার নীলমাধব দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখতে পেলেন পেছনে বেশ কয়েক হাজার লোক মশাল নিয়ে এগিয়ে আসছে। সামনের দিকে জনতাও কম ভারী নয়। সবার হাতে

মশাল আর তাদের কণ্ঠস্বরে আছে, 'জমিদারের মুণ্ডু চাই।'

জমিদার নীলমাধব এবার প্রাণের ভয়ে দৌড়তে লাগলেন। কোনদিকে যাবেন ভেবে পেলেন না। ঐ দিকে পুকুর। তার চারদিকে জনতা। কারু হাতে লাঠিসোটা, বর্শা···। সবাই জমিদারের প্রাণ চাইছে।

এবার জমিদার স্টেশনের পথ ধরলেন। একবার স্টেশনের পথ দিয়ে হাঁটতে পারলে তাকে কেউ আর ধরতে পারবে না।

তিনি স্টেশনের দিকে দৌড়তে লাগলেন। জনতার মধ্যে একজন বলল, পালাচ্ছে, পালাচ্ছে, ব্যাটাকে ধরতে হবে।

স্টেশনের পথের সব বাড়িগুলির ঘর বন্ধ। কোথাও ঢুকবার জায়গা নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে জমিদার নীলমাধব দৌড়তে লাগলেন।

হঠাৎ দেখতে পেলেন রেলওয়ে ডাকবাংলোর একটি ঘর খালি। বাড়ির চারদিকই বন্ধ···শুধু একটা দরজা খোলা আছে। জমিদার নীলমাধব নিজের প্রাণকে বাঁচাবার জন্যে ঐ খালি ঘরে ঢুকলেন।

ডাক বাংলোয় কেউ নেই। জনমানব শূণ্য···। নীলমাধব সবগুলি ঘর খুঁজে দেখলেন। না কেউ নেই। মনে আশা পেলেন। পাগল, উম্মত্ত জনতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে।

জমিদার নীলমাধব বাইরে দরজাটি বন্ধ করতে গেলেন। নইলে ঐ উম্মত্ত জনতা ঘরে এসে ঢুকতে পারে। এমনি সময় কে যেন পেছন থেকে বেশ শক্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, দরজাটি বন্ধ কর না।

জমিদার নীলমাধব ঘরের চারদিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ ছিল বলে মনে হল না।

না দরজা বন্ধ কর না···

কে তুমি?

অন্ধকারে তুমি আমাকে চিনবে না। কারণ তুমি বলতে রাত্রের অন্ধকারে সব মেয়েই সমান···। কাছে এসো···

যন্ত্রের মত নীলমাধব ঐ কণ্ঠস্বরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এবার বাতিটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি···হঠাৎ ঘরের চারিদিকের বাতি-জ্বলে উঠল। জমিদার নীলমাধব আমাকে চিনতে পার?

নীলমাধব বেশ অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন। পরিচিত চেনা মুখ। কোথায়, কবে যেন একে দেখেছেন···কোথায় ?

মনে পড়ছে না···বেশ সতের বছরের আগের এক স্মৃতিচারণ কর। এবার বুঝতে পেরেছ আমি কে ?

নীলমাধব বললেন হ্যাঁ বুঝেছি তুমি মালতী ?

হ্যাঁ সেদিন আমি তোমার কাছে মালতী ছিলাম কিন্তু আজ আমি রায়পুরে গ্রামবাসীদের কাছে হয়েছি 'রানীমা'।

বল, কিছু মনে পড়ছে···মালতী জবাব দিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ···মনে পড়েছে। আমি তোমাকে ভালবাসতুম···

না, নীলমাধব জীবনে কোনদিন কাউকে ভালবাসোনি। ভালবাসার আত্মাই তোমার ছিল না। শুধু তুমি মেয়েদের দেহকে ভালবাসতে। আজ যে রাত্রের রানী, কালকে বাঁদী।

নীলমাধব বললেন, না না মালতী আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসতাম···নইলে···

তাহলে তোমার মনে পড়েছে সব কথা। তুমি আমাকে বহুবার বলেছ আমাকে ভালোবেসেছ··· ।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসতাম বলেই আমি তোমাকে নারায়ণ সাক্ষী করে বিয়ে করেছিলাম···জমিদার নীলমাধব জবাব দিলেন।

পাগলের অট্টহাসি হাসল মালতী।

হ্যাঁ বিয়ের একটা প্রহসন করেছিলে বটে। আজকাল বাজারে তো অনেকেই এইরকম বিয়ের প্রহসন করে। পরে মেয়েকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। তুমিও আমাকে তাই করেছিলে। বল তুমি আর পুরুতঠাকুর আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলে। তোমার মোসাহেব পুরুত কতগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করল। পরে বললে, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। সেই রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে সহবাস করলে।

নীলমাধব জোরে প্রতিবাদ করে বললে, না, না, সত্যি সত্যি আমি সেদিন তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।

মিথ্যে কথা বল না নীলমাধব। আমাকে তুমি বিয়ে করনি। পুরুতঠাকুর স্বীকার করেছেন ঐ বিয়ের মন্ত্রগুলি ছিল প্রহসন,

শুধু আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে। যাক, ঐ নিয়ে তর্ক করব না। মনে পড়ে তুমি এরপরও আমার সঙ্গে বেশ কয়েকদিন সহবাস করলে। পরে আমি গর্ভবতী হলাম…। তুমি বললে বিয়ের ব্যাপারটি তোমার বাবাকে বলবে এবং পঞ্চায়েতে ঘোষণা করবে। করোনি।

নীলমাধব মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো, হ্যাঁ আমাদের একটি শিশু সন্তান হয়েছিল। ছেলে না মেয়ে বলতে পারব না।

মালতী আবার হাসল। বলল, ঐ শিশুসন্তান ছিল একটি ছেলে। আমার সন্তান, আমার রক্ত-মাংসের সৃষ্টি। না, তুমি সেদিন নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দিতে চাওনি। কারণ ঐ সন্তান ছিল তোমার কাছে কলঙ্কের নিশানা। কিন্তু আমার কাছে ঐ সন্তান ছিল আমার আত্মা, আমার দেহ এবং আমার দেহপ্রাণ। তারপরে তুমি কী করেছিলে মনে পড়ে? তুমি হয়তো ভয় পেয়েছিলে তোমার ঐ সন্তান জন্মাবার কাহিনী রায়পুর গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে এবং সবাই জানতে পারবে, সবার কাছে প্রকাশিত হবে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ…। আমাদের একটি ছেলে হয়েছে। শিশুর জন্মের তিনরাত্রি পরে তোমার কলঙ্ক, আমার সঙ্গে তোমার যে গভীর সম্পর্ক হয়েছিল, সেইটে দূর করবার জন্যে সন্তানকে হত্যা করলে। হ্যাঁ, নীলমাধব তুমি ছোট্ট একটা শিশু প্রাণী হত্যা করেছিলে, তুমি খুনী। তোমার সেই খুনের কোন ক্ষমা নেই। তারপর তুমি ঠিক করলে আমাকে রায়পুর থেকে তাড়াতে হবে। এখানে আমার উপস্থিতি ছিল তোমার কাছে বিপজ্জনক। তাই একদিন পাড়ার পঞ্চায়েতকে ডাকলে। ওখানে সবাই ছিল। তোমার মোসাহেব চাটুকারদের দল। তাদের কাছে তুমি নালিশ করলে আমি হলাম গণিকা, পতিতা, বেশ্যা। অতএব আমাকে এ শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। নইলে সবার চরিত্র খারাপ হবে। তোমরা আমাকে বের করে দিলে। আমি বোম্বাইতে গিয়ে হলাম বাঈজী। বিখ্যাত মালতী বাঈজী। কিন্তু আমি আমার শিশুকে হত্যা করবার কথাটি ভুলিনি…

তুমিই মালতী বাঈজী? নীলমাধব জিজ্ঞেস করল।

কেন 'বাঈজী' নামটি শুনে বুঝি আবার উৎসাহিত বোধ

করছ।

না, না, আমি তোমাকে এ গ্রাম থেকে তাড়াইনি···

আজ পঞ্চায়েতের সভায়, এমন কী তোমার অতি প্রিয় অনুতোষও স্বীকার করে নিয়েছে আমার জীবনের সর্বনাশের মূলে ছিলে তুমি। তারা সবাই বলেছে যে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে এবং আমাদের একটি শিশু সন্তান হয়েছিল। আর তুমি নৃশংসভাবে তিনদিনের ঐ শিশুকে হত্যা করেছিলে। তাই ওরা সবাই সর্বসম্মতি সহকারে বলেছে তোমার এই সাজার একমাত্র শাস্তি হল প্রাণদণ্ড। তাই জনতা সেই বিচার চাইছে।

বাইরের জনতার চিৎকার ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। হঠাৎ মালতী সামনের দরজা খুলে দিয়ে বলল, ঐ যে জনতা ওরা তোমার জন্যে এসেছে। ওরা পঞ্চায়েতের লোক। এবার তুমি ওদের কাছে যেতে পার।

এই বলে মালতী দরাম করে নীলমাধবের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরে থেকে উন্মত্ত জনতার আনন্দোল্লাস শোনা গেল। তার-পরই শোনা গেল এক ভয়ার্ত মানুষের কণ্ঠস্বর···এ কণ্ঠস্বর ছিল নীলমাধবের তার মৃত্যুর কান্না···

পরের দিন বিকেলে চারটের সময় বোম্বাই ট্রেন রায়পুর স্টেশনে থামল। সাধারণত মেল ট্রেন এখানে থামে না। কিন্তু আজ থামল।

রানীমা তার কুকুর নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলেন। আজ জনতা বেশি ছিল না শুধু স্টেশন মাস্টার রানীমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন।

স্টেশন মাস্টার রানীমাকে বললেন, খবরটা নিশ্চয় শুনেছেন ?

কোন খবর ? রানীমা জিজ্ঞেস করেন।

কাল রাত্রে উন্মত্ত জনতা রায়পুরের বিলাসী, অত্যাচারী জমিদার নীলমাধাবকে খুন করছে।

ব্যাঙ্গের হাসি হাসলেন রানীমা। জানেন মাস্টারমশাই, যখন মানুষ নির্জীব হয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না সমস্ত প্রকার

অন্যায় অবিচারকে সহ্য করে নেয়, কিংবা সে যখন কথা বলবার শক্তি হারায় ক্লীব হয়, মেরুদণ্ড ভেঙে যায় তখন তাদের জাগিয়ে তুলবার জন্যে রুপোর চাবুকের দরকার হয়। সেই রুপোর চাবুক কী জানেন মাস্টারমশাই ?

কী ? কৌতূহলী হয়ে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

টাকা, টাকা, টাকা···

রানীমা এই বলে ব্যাঙ্গের হাসি হাসলেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

—৮—